لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ১৫ই/২৯শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৪ সন : ১৯/২০শ সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

"হে ইউরোপ। তুমিও নিরাপদ নহ; হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লুতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

—হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯০৬

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে—৩ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

১৯।২০শ সংখ্যা
১৫/২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রঃ) ॥	৩৬৯
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥	অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ ॥	৩৭০
॥ ইস্রায়েলীয় ভাববাদী যীশু ॥	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী ॥	৩৭১
॥ মিরাজ সমস্যা ॥	জনাব আলী ॥	৩৭৪
॥ আহ্‌মদী পৃথক সম্প্রদায় কেন? ॥	মকবুল আহ্‌মদ খান ॥	৩৭৯
॥ রমযান মাসে ॥	সরফরাজ এম. এ. সাত্তার ॥	৩৮৪
॥ খেলাফত ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ ॥	মোহাম্মাদ বদিউজ্জমান ভুঞা ॥	৩৮৬
॥ বিজ্ঞান ও ইসলাম ॥	মকবুল আহ্‌মদ খান ॥	৩৯২
॥ প্রশ্নোত্তর ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	৪০১
॥ পরকাল ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	৪০৬
॥ খেলাফতের বরকত দীর্ঘ হওয়ার জন্য দোয়া ॥	হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাযিঃ) অনুবাদক—এ. এইচ. মুহম্মদ আলী আন্‌ওয়ার ॥	৪০৭

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫/২৯শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৪ সন ১৯/২০শ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মুমতাজ আহমদ সাহেব মরহুম (রঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আল-আনআম

৭ম রুকু

৫৭। (হে নবী তুমি কাফিরদিগকে) বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করিতেছ তাহাদের উপাসনা করিতে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা গিয়াছে। তুমি বল, আমি তোমাদের কু-অভিপ্রায়গুলির অনুসরণ করিব না। (যদি করি) তাহা হইলে আমি ভ্রষ্ট হইয়া যাইব এবং সৎপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।

৫৮। তুমি বল নিশ্চয় আমি আমাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত উজ্জ্বল প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত এবং তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া থাক। তোমরা যাহার জন্য দ্রুততা

করিতেছ তাহা আমার ক্ষমতাধীন নহে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কোন প্রভুত্ব নাই। তিনি সত্যকে বর্ণনা করিয়া দেন এবং তিনিই মীমাংসাকারীদের শ্রেষ্ঠতম।

৫৯। তুমি বল তোমরা যাহা দ্রুত ঘটিতে চাহিতেছে তাহা যদি আমার আয়ত্বাধীন থাকিত তাহা হইলে অবশ্য আমার ও তোমাদের মধ্যে বিষয় মীমাংসা হইয়া যাইত এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে অধিকতম অবগত।

৬০। এবং তাঁহারই নিকট অজ্ঞাত ভাণ্ডার সমূহ। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উহা জ্ঞাত নহে এবং যাহা জলে ও স্থলে আছে তাহাও তিনি অবগত আছেন। এবং প্রত্যেকটি বৃক্ষপত্র যাহা পতিত হয় তাহাও তিনি জানেন এবং প্রত্যেকটি দানা যাহা ভূগর্ভস্থ গভীর অন্ধকারে নিহিত আছে এবং প্রত্যেকটি সরস ও নীরস যাহা আছে তাহাও বিশদ বিবৃতিকারী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৬১। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তোমাদিগকে রাত্রিকালে (নিদ্রা দ্বারা) মৃত্যু দান করেন এবং দিবাকালে তোমরা যাহা কর তাহাও তিনি জানেন এবং দিবাভাগে তিনি তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করেন, সেই নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ পরিপূর্ণ করার জন্য। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তৎপর তোমরা যাহা করিতেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

✱

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃত-বাণী

এখন 'তৌবা' করিবার সময়। যখন আজাব উপস্থিত হয়, তখন তৌবার দুয়ার রুদ্ধ হইয়া যায়। তৌবাতে বহু কিছু নিহিত আছে। দেখ, যখন কোন বাদশাহ্ কোন এক ব্যাপারে লোক-জনকে বুঝাইয়া বলে যে, ইহা হইতে বিরত থাক; তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে। তখন যে ব্যক্তি বিরত থাকে, তাহার মঙ্গল হয়। নতুবা উহার শাস্তি ভীষণ কঠোর হইয়া থাকে। এমনিভাবে প্রথমে আল্লাহ্-তা'লা ছোট ছোট আজাবের দ্বারা লোক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এক্ষণে বিরত হইয়া যাও, নতুবা অনুতপ্ত হইবে। কিন্তু তবুও যখন তাহারা বোঝে না, এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী (অবাধ্যতা) হইতে বিরত হয় না, তখন তাঁহার আজাব ভীষণ আকারে উপস্থিত হয়, যেমন এই আয়াতে বর্ণিত আছে —

و لا يخاف عقباها

অর্থাৎ—শাস্তি দেওয়া কালে তাহাদিগের (মারাত্মক) পরিণামের পরোয়া করেন না।

তোমরা আমার হস্তে বয়'আত গ্রহণ করিয়াছ, —ইহারই উপর নির্ভর করিও না। কেবল এই টুকু কথাই যথেষ্ট নহে। মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা কিছুই লাভ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই স্বীকৃতিকে কার্যে পরিণত না করে। মৌখিকভাবে অনেক মোসাহেবও প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তিই সত্যবাদী, যে সেই প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করে। আল্লাহ্-তা'লার দৃষ্টি মানুষের অন্তরের উপর। সুতরাং এখন হইতে অঙ্গিকারকে সত্যে পরিণত কর এবং কথার সহিত হৃদয়কে সংযুক্ত করিয়া বদ্ধপরিকর হও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবরে না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রকারের গুনাহ, শীরক ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিবে।

(আল-হাকাম ৩১শে মার্চ, ১৯০৩ ইসাব্দ)

অনুবাদক – আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

●

ইস্রায়েলীয় ভাববাদী যীশু

আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী

'রাছুলান ইলা বনিইছরাইল'

[আল-ইমরান, ৫০ আয়াত]

অর্থঃ—"যীশু কেবল ইস্রাইল গোত্রের জন্য ভাববাদী।"

ইছা মসিহ ছিলেন কেবল বনি-ইসরাইলের জন্য নবী। ইসরাইল বংশীয় দ্বাদশ গোত্রের উদ্ধার কর্তারূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি। ইসরাইল ব্যতীত অন্য কোন জাতির নিকট তিনি প্রেরিত হন নাই। কোন ভাববাদী বা ব্যবস্থা গ্রন্থকেও তিনি বাতিল বা রদ করিতে আগমন করেন নাই; তিনি ছিলেন মোশী বা মুসা নবীর শরিয়ত ব্যবস্থার অধীন মসিহ। আমরা এখন 'ইনজিল' বা 'নূতন নিয়ম' হইতে দেখাইব যে, যীশু আপন শিষ্যদিগকে সর্বদা মোশীর ব্যবস্থা পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন; ইসরাইল ছাড়া অন্য জাতির নিকট প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এমন কি যে সকল ভিন্ন জাতীয় লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে চাহিয়াছে; তাহাদিগকে 'কুকুর' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এইরূপ কঠিন নিষেধ বাক্য থাকা সত্বেও পরজাতিগণ খ্রীষ্ট ধর্মে অনধিকার প্রবেশ করিতেছেন! আমাদের দেশের অনেক লোক যাহারা অভাব অনটনে 'ভারাক্রান্ত' হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞতা বশতঃ জানেন না যে, তাঁহাদের এই অনধিকার প্রবেশের ফলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট ত নহেনই বরং ভয়ানক অসন্তুষ্ট। এই জাতীয় অনধিকার

প্রবেশকারীকে যীশু 'কুকুর' আখ্যা দিয়াছেন। দেখুন,—"আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটি কনানয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন; আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্থ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন; কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।" (মথি, ১৫:২২-২৬)। অন্যত্র পর জাতিগণকে 'কুকুর' ও 'শূকর' বলিয়াছেন। দেখুন, মথি, ৭:৬। যীশু তাঁহার বারজন শিষ্যকে আদেশ দিলেন,—"তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।" (মথি, ১০ : ৬)।

যীশু ছিলেন মোশীর ব্যবস্থার অধীন, তিনি ব্যবস্থা বা ভাববাদী গ্রন্থকে রহিত করিতে আগমন করেন নাই। যেমন যীশু বলেন,—"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে সে পর্যন্ত ব্যবস্থার একমাত্রা, এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব, যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে। কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা যাইবে।"

(মথি, ৫:১৭—১৯)।

তিনি বলেন, "ব্যবস্থার একবিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ।" (লুক ১৬ : ১৭)

যীশু বলেন, "মোশীর আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।" (লুক, ৫ : ১৪) ও (মথি, ৮ : ৪। ইহার পর দেখুন :—মথি, ৭ : ১২; ১৯ : ১৮; ২২ : ৪০; ২৩ : ৩ ও ২৩; লুক ২৪ : ১; যোহন, ৭ : ২১—২৪; যাকোব, ৪ : ১১, ১২, প্রভৃতি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যেহেতু যীশু ব্যবস্থা ও ভাববাদী গ্রন্থকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন সেইজন্য ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিবার আর কোন প্রয়োজন নাই, কেননা যীশু খ্রীষ্টই তাহা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই যুক্তিটি বাস্তবিকই অদ্ভুত। কারণ, ব্যবস্থা বা ভাববাদী-গ্রন্থকে পূর্ণ করার অর্থ কোন অবস্থাতেই ব্যবস্থা বা ভাববাদী গ্রন্থের লোপ বা ধ্বংস বুঝায় না। তাহা ছাড়া স্বয়ং যীশু বলিয়া গিয়াছেন যে, "যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না।" (মথি, ৫ : ১৮)। এইখানে যীশুর আগমনের পর ব্যবস্থা এবং

ভাববাদীগ্রন্থ পূর্ণ হওয়ার অর্থ ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থে যীশুর আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া বুঝায়।

খ্রীষ্ট ধর্মে পরজাতিগণের প্রবেশ

উপরে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, যীশু অত্যন্ত কঠোরভাবে খ্রীষ্ট ধর্মে পরজাতির প্রবেশ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে কিলিকিয়ার তার্ষ নগরের অধিবাসী শৌল বা পৌল নামক জনৈক ব্যক্তি মহাত্মা যীশুর শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। এই পৌলই সর্ব প্রথম যীশুর নিষেধ অমান্য করিয়া পরজাতির মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের অনধিকার প্রচার ও তাহাদিগকে দীক্ষিত করার পথ সৃজন করেন, এবং খ্রীষ্টের নামে নিজ মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

প্রথম জীবনে পৌল ছিলেন যীশুর ভয়ানক শত্রু। যেমন পৌল বলেন, "পূর্বে আমি ধর্ম নিন্দুক, তাড়নাকারী ও অপমানকারী ছিলাম।" (১ তিমথিয়, ১:১৩)। "আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম।" (গালাতীয়, ১ : ১৩)। ইহার পর যীশুর অবর্তমানে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু ইস্রায়লীয়দের নিকট অত্যাচারিত এবং অপমানিত হইয়া দুঃখে ও অভিমানে বলিলেন, "এখন অবধি আমি পরজাতিদের নিকট চলিলাম।" (প্রেরিত ১৮:৬)। পরজাতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ পরজাতিদের নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি।" (ইফিষীয়, ৩ : ১, ২)। পৌল বলেন, "কিন্তু হে পরজাতিয়েরা, তোমাদিগকে বলিতেছি, পরজাতিয়দের জন্য প্রেরিত বলিয়া আমি নিজ পরিচর্য্যা পদের গৌরব করিতেছি ; যদি কোন প্রকারে আমার স্বজাতীয়দের অন্তর্জ্বালা জন্মাইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের পরিত্রাণ করিতে পারি।" (রোমীয়, ১১ : ১৩, ১৪)।

যীশুর নিষেধ অমান্য করিয়া তিনি যে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া পরজাতিগণের নিকট অনধিকার প্রচার করিতেছেন তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। যেমন পৌল বলেন, "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন ?"
(রোমীয়, ৩:৭)।

পৌল জীবনে কখনও যীশুর সাহচর্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই জন্য যীশুর প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই জন্য খ্রীষ্ট এবং পৌলের শিক্ষার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভালভাবে লক্ষ্য করিলে একটিকে অন্যটির বিপরীত বলিয়া মনে হয়। যেমন যীশু ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে।" (মথি, ৫:১৯)। কিন্তু পৌল এই শিক্ষার বিপরীত ব্যবস্থাকে 'পাপ শিক্ষাদানকারী' বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। দেখুন, (রোমীয় ৭ : ৭—৯)।

নিম্নে যীশু এবং পৌলের শিক্ষার মধ্যে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি পার্থক্য দেখান হইল। যথা :—

যীশুর শিক্ষা

১। যীশু ব্যবস্থা বা ভাববাদীগ্রন্থকে লোপ করিতে আসেন নাই বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। মথি, ৫ : ১৭—২০।

২। পরজাতির নিকট প্রচার করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। মথি, ১০ঃ৬, ৭।

৩। যীশু মোশীর আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন। মথি, ৮ : ৪।

৪। ব্যবস্থার নির্দেশানুযায়ী যীশুর ত্বকচ্ছেদন হইয়াছে। লূক, ২ঃ২১। কেননা ইহা ঈশ্বরের চিরস্থায়ী নিয়ম। দেখুন, আদি, ১৭ : ১১।

পৌলের শিক্ষা

১। পৌল বলেন, 'আমরা ব্যবস্থার অধীন নহি'। রোমীয়, ৭ : ৬।'

২। পৌল পরজাতির নিকট প্রচার কার্য চালাইলেন। প্রেরিত, ১৮ : ৬।

৩। পৌল মোশীর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। প্রেরিত, ২১ : ২১।

৪। পৌল, ত্বকচ্ছেদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গালাতীয়, ৫ : ২।

*

মিরাজ সমস্যা

জনাব আলী

(১)

মিরাজ যাত্রার পথে আকাশে নবী করীম (সাঃ) আদম, ইব্রাহিম, মুছা, ঈছা (আঃ) এই সব নবীদিগের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ মুসলমানের প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঈছা (আঃ) এখনও আকাশে স্বশরীরে জীবিত আছেন। কিন্তু অন্য নবীগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন দাড়ায় যে, জীবিত ও মৃত কি একই পর্য্যায়ে আছে? যারা মৃত তাদের তো আর আমাদের মত পার্থিব শরীর নাই। বরং তাদের এখন রুহানী শরীর বর্ত্তমান। নবী করীম কি প্রকারে তাঁহার পার্থিব চক্ষু দ্বারা রুহানী শরীর বিশিষ্ট নবীদিগকে দেখিতে পাইলেন? ইহা অসম্ভব। কোরান ইহা স্বীকার করে না। অতএব ইহাই সত্য যে, নবী করিম (সাঃ) তাঁহার রুহানী চক্ষু দ্বারাই ঐ সমস্ত রুহানী শরীর বিশিষ্ট নবীদিগকে দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। অতএব অন্যান্য নবীদিগের দর্শন একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার বৈ অন্য কিছু নয়।

কোরান বলে :—

وما يستوى الاحياء ولا الا موات

ফাতের—৩ রুকু

জীবিত ও মৃত এক প্রকারের হয় না। সকল বিষয়েই জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা থাকিবেই। ইহা কোরানের বিধান, ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়ম। স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী অবস্থানের দিক দিয়াও জীবিত ও মৃত এক পর্যায়ে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব জীবিত ঈছা (আঃ) এবং মৃত অন্য নবীগণ কখনও আকাশে একই পর্যায়ে থাকিতে পারেন না। ঈছা (আঃ) যদি সত্যই আকাশে অন্যান্য নবীদিগের সহিত একই পর্যায়ে থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মৃত ঈছা (আঃ) অথবা অন্যান্য নবীগণও নিশ্চয়ই তবে জীবিত আছেন।

(২)

যাহারা মৃত তাহারা এখন কোথায়?

আল্লাহ বলেন :—

فيها تحيون وفيها تموتن ومنها تخرجون

এই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন ধারণ করিবে, এবং এখানেই তোমরা মৃত্যুলাভ করিবে এবং এই পৃথিবীর ভিতর হইতে তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে (শেষ বিচারের দিন)। উপরে মানব জীবনের যে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ পাইলাম তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই তিন পর্যায়ের মানুষকে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইতেছে। মৃত মানুষকে যখন পৃথিবীতেই থাকিতে হইবে এবং নবীগণও যেহেতু মানুষ, তাহাদিগকেও জীবিত ও মৃত সকল অবস্থাতেই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। নবী করীম কি প্রকারে এই সমস্ত মৃত নবীদিগকে আকাশে দেখিলেন? নবীগণের আগমন হয় আল্লাহ্‌র বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। তাঁহারা কখনও আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা করিতে পারেন না।

অতএব ইহা অনস্বীকার্য যে, এই পৃথিবীতেই তাঁহাদের সহিত নবী করীমের (সাঃ) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহাতে আবার প্রশ্ন উঠে যে, মৃত ব্যক্তিদের দর্শন যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আমরাও দেখিতে পাইতাম। অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা বাদ দিয়া আমাদের যাহারা নিকট আত্মীয়, যাহাদের সহিত আমাদের এককালে প্রাণের সম্বন্ধ ছিল, যাহাদের অদর্শনে প্রাণ বিরহ কাতর হয়, তাহাদের মৃত্যুর পরে আর তাহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাই না কেন? কারণ মৃতকে পার্থিব বাহ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন করা অসম্ভব। নবী করীমও (সাঃ) বাহ্য চক্ষু দ্বারা মৃত নবীদিগকে দেখেন নাই। বরং আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারাই তিনি তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। অতএব ইহা আধ্যাত্মিক দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অন্যান্য নবীদের সহিত ঈছা (আঃ)-কে একই পর্যায়ে দেখিয়াছিলেন। তাহা হইলে ঈছা (আঃ)ও নিশ্চয় মৃত। কারণ তিনি জীবিত থাকিলে শুধু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কেন আমরা সকলেই তাঁহাকে আমাদের বাহ্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যেহেতু তিনিও মৃত, এবং তাঁহাকে দেখিতে অন্তঃচক্ষুর প্রয়োজন আছে—যাহারা অন্তঃচক্ষুর ঐ দৃষ্টি পাইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। নবী করীম (ছাঃ)ও দেখিয়াছেন।

(৩)

কেহ কেহ বলেন বেহেস্তে ঐ সমস্ত নবী-দিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদি তাহাও সত্য হয় তবুও সমস্যা দাড়ায় যে, আল্লাহ্‌র বিধান মতে বেহেস্তে প্রবেশকারীকে বেহেস্ত হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে না। এবং স্বয়ং প্রবেশকারীও তথা হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে না। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

ان المتقين فى جنت وعيون
ادخلوها بسلام ٥

امنين ... وما هم منها بمخرجين ٥

'নিশ্চয় মোত্তাকীগণ ঝরণা প্রবাহিত জান্নাত মাকামে প্রবিষ্ট হইবে এবং শান্তিতে ও নিরাপত্তার মধ্যে সেখানে অবস্থান করিবে। ..... তাহাদিগকে সেখান হইতে বহিষ্কার করা হইবে না।' মৃত্যুর পরে নবীগণ যদি বেহেস্তে প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেখান হইতে বহিষ্কার করা হইবে না। তাঁহাদেরকেও তথা হইতে বাহির হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অসুবিধা হইল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ঈছা (আঃ)-কে লইয়া। কারণ মিরাজ অন্তে রাসুলুল্লাহ্‌কে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এবং ঈছা (আ')-কে শেষ যুগে আবার পৃথিবীতে আসিতে হইবে (প্রচলিত মতানুযায়ী) ইঁহারা বেহেস্ত হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলে আল্লাহ্‌র আইন রদ হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতপক্ষে নবী করীমের সহিত অন্য নবীদের সাক্ষাৎ বেহেস্তে হয় নাই। বস্তুতঃ বস্তুজগতে জীবিত থাকা অবস্থায় কেহই বেহেস্তে যাইতে কিম্বা বেহেস্ত দর্শন করিতে পারে না। কোরান বলে, "কেহই জানে না যে, কি সম্পদ তাহাদের জন্য লুক্কায়িত আছে বেহেস্তে, যাহা তাঁহাদের চক্ষুকে স্নিগ্ধ করিবে।"

বেহেস্ত-দোজখের অবস্থানের প্রশ্ন ও সমস্যাপূর্ণ। কোরানে ইহাদের অবস্থানের কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। পূর্ব বর্ণিত আয়াত অনুসারে এই পৃথিবী-তেই মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, এখানেই তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, এবং এই পৃথিবীর উপরেই আবার তাঁহার পুনরুত্থান হইবে শেষ বিচারের দিবসে। ইহার পরে আর দুইটি পর্যায় থাকে; (১) মহাবিচারের সম্মুখীন হওয়া (২) বিচারে কর্মনুযায়ী ফল লাভ, অর্থাৎ বেহেস্ত উপভোগ কিম্বা দোজখ ভোগ। শেষ বিচারের জন্য যখন আমাদের তলব হইবে তখন আমরা দলে দলে এই পৃথিবীর উপরেই পুনরুত্থান করিব। তাহা হইলে শেষ বিচার ও এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। বিচারের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে যে অন্য কোন জগতে লইয়া যাওয়া হইবে সেরূপ কোন প্রমাণ নাই। বিচার কার্য্য যদি এই পৃথিবীতে সম্পন্ন হয়, শাস্তি বা পুরস্কার লাভও এখানেই হইবে। ইহার জন্যও অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্রলোকে আমাদিগকে লইয়া যাওয়ার কোন প্রামান্য ইতি-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। অতএব বেহেস্ত, দোজখ এই পৃথিবীর বাহিরে কোথাও আছে বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা হইলে নবী করিমের বেহেস্ত দোজখ দর্শন করিতে এই পৃথিবীর বাহিরে কোন শূন্যমার্গে গমনের প্রয়োজন নাই।

(৪)

আকাশে আরোহণ করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোরাণ ইহার বিপক্ষে রায় দেয়। কোরাণ বলে ঃ

او ترقى فى السماء ٥ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ٥ قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ٥

(নবী করীমের প্রতি কাফেরদের উক্তি) অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর, এবং তোমার আকাশে আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করিব না, যদি না তুমি আমাদের জন্য এমন একটি কেতাব আনিতে পার যাহা আমরা পড়িতে পারি। (ইহার জবাবে আল্লাহ্ রাসুলকে বলিয়া দিতেছেন) বল, (হে মোহাম্মাদ) মহিমা আমার প্রভুর। আমি মানুষ রসুল বৈ আর কিছু কি? অর্থাৎ রাসুল হওয়া সত্ত্বেও আমি মানুষ এবং আকাশে আরোহণ যেহেতু মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সেহেতু তোমাদের ইচ্ছামত আমি আকাশে আরোহণ করিতে পারি না। একদিকে দেখি তিনি মানুষ বিধায় আকাশে আরোহণ করিতে পারেন না, কিন্তু মিরাজের রাত্রিতে তিনি আবার কি প্রকারে আকাশে উঠিলেন? তখন কি তিনি মানুষ ছিলেন না? না তখন আল্লাহ্‌র এ বিধান বলবৎ হয় নাই, না তিনি সাময়িকভাবে কোরাণের ও আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করিয়াছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ্)। মিরাজের উদ্দেশে নবী করীমকে প্রকৃতপক্ষে যে আকাশে উঠান হয় নাই, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

সুরা নজমে মিরাজের বর্ণনা আছে। মিরাজ সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রথমের দিকে আছে ثم استوى - 'অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন'। এবং মোহাম্মাদ আল্লাহ্‌র হুজুরে নীত হইলেন। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ এত নিকটবর্ত্তী হইলেন যে, মাঝ খানে ব্যবধান রহিল মাত্র দুই ধনুকের জ্যা পরিমাণ। আল্লাহ্‌র এই সিংহাসন কোথায়, কেমন তার রূপ, কত বড় ইহা, ইহা কি আকাশে, না পাতালে, না এই পৃথিবীতে? এ বিষয়ে কোরাণ বলে ঃ

وسع كرسيه السموات والارض

—'আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহার সিংহাসন'। আমরা পৃথিবী ও আকাশের কতটুকু আমাদের দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, কিম্বা আমাদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার সিংহাসন এত বিরাট, এত বিস্তৃত যে, আমরা আমাদের জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সিংহাসনের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। আল্লাহ্‌র সহিত দীদার যেখানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে স্থান আমাদের বাহ্য-দৃষ্টি ও জ্ঞান-দৃষ্টির উর্দ্ধে অবস্থিত। আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের উর্দ্ধতম দেশে পৌছিয়া তবে রাছুল (সাঃ) আল্লাহ্‌র সন্নিধানে আসিয়াছিলেন।

وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى

—'তিনি [মোহাম্মাদ (দঃ)] ছিলেন দিগন্ত পরিধির উর্দ্ধতম দেশে'। তাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আরও নিকটবর্তী হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন। এইখানে

পৌঁছিবার উপযুক্ত করিতে তাহাকে যে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ্ নিজে তাঁহাকে সে শিক্ষা দিয়াছিলেন :

عـلـمـه شـديـد الـقـوى

সকল শক্তির সুদৃঢ় অধিকারী আল্লাহ্ তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এমনই যে আল্লাহ্ যাঁহার সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া, এবং যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে দৃষ্টি ও জ্ঞানের দিগন্ত পরিধির উর্দ্ধতম দেশে পৌঁছিবার প্রয়োজন, কোথায় এবং কি প্রকারে তার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব? আল্লাহ্ বলেন : اينـمـا تـولـوا وجـه الله

—তোমরা যেদিকেই তাকাও দেখিবে আল্লাহ্র দৃষ্টি (সেদিকে) আছে; অর্থাৎ উর্দ্ধ অধঃ ডাইনে-বামে, অগ্রে-পশ্চাতে সকল দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে। আমরা এখন যেখানে আছি এখানেও আল্লাহ্ তার চক্ষু মেলিয়া আছেন। অতএব আল্লাহ্কে দেখিবার প্রয়োজনে তাঁহাকে দেখিবার শক্তি অর্জন করা চাই, তাহা হইলে যত্রতত্র তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে। মোহাম্মাদ (দঃ) সে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাই তিনি তাঁহাকে স্বস্থানে থাকিয়াই দর্শন করিয়াছিলেন। চর্ম চক্ষে তাঁহাকে দর্শন করা সম্ভব নয়। কোরআন বলে لا تـدرکـه الـبـصـر কোন চক্ষুই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। মুছা (আঃ)-ও তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্ জবাব দিয়াছিলেন : لـن تـرنـى (তুমি আমাকে দেখিতে পার না)। রাসুল মকবুল (সাঃ)-ও তাহাকে চর্ম চক্ষু দ্বারা কখনও দর্শন করেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করিতে, কোরআনের বিরোধিতা করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে দেখিবার দাবী করিলে স্পষ্টতঃ কোরআনের বিরোধিতা করা হয়। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসুলুল্লাহ্ অন্তঃচক্ষু দ্বারাই আল্লাহ্কে দেখিয়াছিলেন।

তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহ তাঁহার জ্ঞানের দৃষ্টিতে অতি স্বচ্ছ ভাবেই দর্শন করিয়াছিলেন। মিরাজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। মিরাজ সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের বর্ণনার শেষে আল্লাহ্ বলিতেছেন :

لـقـد رأى مـن ايـات ربـه الـكـبـرى

নিশ্চিত সত্য এই যে তিনি [মোহাম্মাদ সাঃ] তাঁহার পরওয়ার দেগারের মহান নিদর্শনগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে :

مـا كـذب الـفـؤاد مـا رأى

—অন্তঃকরণ [মোহাম্মাদের (সাঃ)] বিভ্রম করে নাই তাহাতে যাহা (উক্ত অন্তঃকরণ) দেখিয়াছিল।

অবশেষে আল্লাহ্ নিজেই জানাইয়া দিতেছেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার অন্তঃকরণ দ্বারাই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্কে নয় বরং তাঁহার (পরওয়ার দেগারের) মহান নিদর্শনগুলিকে দর্শন করিয়াছিলেন।

এই মিরাজের কোন অবস্থাতেই নবী করীমের পার্থিব দেহ বা দেহাংশের কোন প্রয়োজন হয় নাই। অথচ আমরা তাঁহার দেহটাকে লইয়া কত টানাটানিই না করি। মিরাজের প্রাণবস্তুকে অবহেলা

করিয়া, নবী করীমের বাহিরের খোলস ধরিয়া টানা হেচড়া করিলে মিরাজের ন্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যাপারের সমাধান মিলিবে না, বরং বিভেদকারীদের মনের সংশয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপলব্ধি করিবার তৌফিক দান করুন, যাহারা এখনও অযথা বিশ্বাস করে বসে আছেন যে, মিরাজ দৈহিক উত্তোলন দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

✱

আহ্মদী পৃথক সম্প্রদায় কেন ?

মকবুল আহ্মদ খান

আহ্মদী ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে প্রায়ই উপরোক্ত প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষিত সরল প্রাণ সাধারণ মুসলিম ভাই-ভগ্নিরা প্রশ্ন করেন, 'আহমদীগণ নামাজ রোজা অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা কোরাণ ও হাদিসের শিক্ষাকে প্রচার করে থাকেন এবং নিজের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেশ-বিদেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করে থাকেন। এসব ইসলামী ভাল কাজ করা সত্বেও তারা অন্যান্য মুসলমান হতে পৃথক সম্প্রদায় বলে পরিগণিত কেন ?"

প্রশ্নটা অতি স্বাভাবিক। আর তার উত্তরও অতি সহজভাবে দেওয়া চলে। সাধারণ মুসলমানগণই আহমদীগণকে একটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করার জন্য দায়ী। আহ্মদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে, ইসলামের পণ্ডিতগণ ইসলাম-সুলভ-সহনশীলতার পরিচয় দেননি। মতের যে দিকটাতে মিল আছে, সেদিকে জোর না দিয়ে, যে দিকে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় সেদিকে নিরতিশয় জোর দেন। তাহাদের প্ররোচনায় সর্বসাধারণের এবাদৎগাহ্ মস্জিদ হতে জোর পূর্বক আহমদীয়া (তখনও এরূপ নামকরণ হয় নাই) মতাবলম্বী মুসলমানগণকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্র মস্জিদের দরজায় লিখা হল, "এই মস্জিদে কুকুর সদৃশ মির্যায়ীগণের (হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ আলাইহেস্ সালামের আদর্শে অনুপ্রাণিত) আগমন নিষেধ। আলেম উলামা ও সাধারণ মুসলমানের অমানুষিক অত্যাচার, গালিগালাজ ও অকথ্যনির্য্যাতন আপনা হতেই আহ্মদী সম্প্রদায়কে একটা পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করে।

এখানে একটা জ্বলন্ত উদাহরণের অবতারণা বোধ হয় অবান্তর হবে না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাবিদকেই বলতে শুনা যায় যে মুসলমানদের নিজেদের রাজনৈতিক চেতনা ও ত্যাগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু দায়ী, হিন্দুদের মুসলেম-বিদ্বেষ ও অনমনীয় বৈরীভাব তার চেয়ে আরও বেশী দায়ী। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি বর্ণহিন্দুদের চিন্তার অতীত ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি একটা ঐতিহাসিক সত্য। এমনিভাবে

আহ্‌মদীয়া মতবাদে উদ্বুদ্ধ মুষ্টিমেয় মোস্‌লেম-গণকে বিদ্বেষের অনলে পুড়ে মারবার এবং অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে পিষে ফেলবার মত অনৈস্‌-লামিক ফন্দির পরিপ্রেক্ষিতেই এই জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কোন প্রকার আপস-রফা করতে অসমর্থ হওয়ায় খোদার আদেশে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীয়া জমাতকে একটি পৃথক নাম দান করেন। পৃথক জমাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং তার স্থিতি ও ক্রম-বিস্তৃতি আজ সুবিদিত সত্য এবং এ সত্যের পিছনে আহ্‌মদী মতবাদের বিরোধীদের বৈরীভাবই বিশেষভাবে দায়ী। এইরূপ একটি পৃথক জমাতের সৃষ্টি ইসলামের বিঘোষিত এবং কোরআনের উল্লিখিত নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

হাদিসে আছে ইসলামের শেষ পর্যায়ে যখন ধর্মভাব সম্পূর্ণ গতিহীন হয়ে পড়বে, ইসলাম শত্রুর আঘাতে হীনবল হয়ে পড়বে, মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্মে আন্তরিকতাবিহীন গতানুগতিকতা শুধু বিরাজ করবে, তখন খোদার প্রত্যাদিষ্ট মসিহ্ মাহ্‌দী উপাধিধারী এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে স্বস্থানে, সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের উৎকর্ষ ও প্রাধান্য স্থাপন করবেন। কোরাণ শরীফেও ভবিষ্যতে আগমণকারী একটি ঈমানদার জামাতের উল্লেখ আছে। মুসলমানগণের ঈমানহীনতা এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক পতনের পরই ইসলামের আদত সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে এই জমাতের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা।

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) নিজকে প্রতিশ্রুত মসিহ্ মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেন এবং তাঁর দাবীর সপক্ষে কোরাণ, হাদিস এবং পূর্ববর্ত্তী আওলিয়াগণের সাক্ষ্য পেশ করেন। তিনি নিজেও বহু অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করেন। কোরাণ হাদিসের বিজ্ঞান সম্মত ও অভাবিত পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করেন এবং প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে দেশ-বিদেশে ইসলামের প্রচার কার্যকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টান জগতে এ ব্যাপারে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল।

তিনি অর্থহীন ছিলেন। বিদ্যা ও তাঁহার তেমন ছিল না। এমতাবস্থায় পৃথিবীব্যাপী ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ, একমাত্র খোদার আদিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। কেন না, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না। খৃষ্টান জগতের সামনে মুসলমান জাতিগুলিকে রুগ্ন, পতিত জাতি বলে মনে হত। তাঁকে মসিহ্ মাহ্‌দী স্বীকার না করলেও, সারা মুসলিম জাহানের উচিত ছিল। তাঁর ইসলাম-প্রীতির জন্য ও ইসলামের সত্যকে বিজ্ঞান সম্মত রূপে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য, তাঁর কাছে অকপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা তাঁর ধর্ম জীবনের প্রথম দিকটায় অবশ্য আলিম-ফাজেল নির্বিশেষে মুসলমানদের সার্বজনীন কৃতজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু "মসিহ-মাহ্‌দী" হওয়ার দাবী করার পর আলীম-উলামাগণের সামান্য অংশ তাঁর অনুসারী রহেন এবং বাকী সবাই তাঁর ধ্বংস সাধনে প্রবৃত হন। তাঁদের চরম বিরোধিতাই দৈহিক ভাবে পৃথক আহ্‌মদীয়া জমাত প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। যাঁরা তাঁরা "মসিহ্ মাহদী" হওয়ার

দাবী অস্বীকার করেন তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, যাঁরা তাঁকে মেনেছেন এবং যাঁরা তাঁকে মানেননি, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। অতএব পৃথক জমাত হিসাবে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

এখানে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলা বিশেষ প্রয়োজন। হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌-মদ (আঃ) কোন পৃথক ধর্ম বা পৃথক সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন করেন নি। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা, কোরাণ ও সুন্নাহ্‌র সৌন্দর্যের দিকে দুনিয়াকে আকর্ষণ করা, ইসলামের জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত অস্তিত্বকে নিদর্শন দ্বারা প্রমাণ করা, হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফার (সাঃ)-এর প্রকৃত সম্ভ্রম দুনিয়ার বুকে স্থাপন করা এবং অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে প্রচলিত খৃষ্টধর্মের অসারতা ব্যাখ্যা করা, এই কয়টিই তাঁহার উপর খোদা কর্তৃক ন্যাস্ত কাজ। ইহা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মধ্যে ইস্‌লাম ব্যতীত অন্য কোন স্বকীয়ত্ব নাই। আর যেটুকু বা স্বকীয়ত্ব আছে, তা ইসলামেরই দান। তিনি কথায় ও কাজে সব সময় ইসলামের এবং মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর গোলাম ও খাদেম বলেই পরিচয় দিতেন এবং তাতেই গৌরববোধ করতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে না মানার অধিকার যেমন একদল মুসলমানদের আছে, তাঁকে মানার অধিকারও অন দল মুসলমানদের আছে। এমন কি অমুসলমানদেরও আছে। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে স্বীকার করেন না, তারা পার্থক্যের সূত্র নিয়া এত বেশী টানাটানি করেন যে, ঐক্যের মূল সূত্র ইসলাম যে উভয়ের মধ্যেই কমবেশী বিদ্যমান, তা যেন তাঁরা ভুলেও স্মরণ করেন না। অথচ আহ্‌মদীদের প্রতি প্রশ্নবান নিক্ষেপ করেন, আপনারা পৃথক জমাত কেন?

একথা সত্য যে, আহ্‌মদী লোকদের ইসলাম প্রীতি, জীবন যাত্রায় ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণ এবং সর্বোপরি জগৎজোড়া ইসলাম প্রচারের দৃষ্টান্ত দেখে অনেক অনভিজ্ঞ মোস্লিম ভ্রাতা অতি আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সহিত পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে থাকেন। বস্তুতঃ আহ্‌মদী জমাত কোন পৃথক ইসলামের অধিকারী নয়। বরং প্রথম যুগের ইসলামকে তার আদত সৌন্দর্যে পুনঃ স্থাপন করতঃ সেই ইসলামকে তাঁরা নিজের জীবনে আমল করে থাকেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে এত ভুল বুঝা বুঝি কেন। এর উত্তর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানোই সহজ হবে বলে মনে করি।

একজন মালিকের একটি বাগান ছিল। তাতে বিভিন্ন ফলের গাছ ছিল। যাঁরা প্রথম বাগান পত্তন করেন, তাঁরা সযত্নে প্রতিটি বৃক্ষের তদা-রক করায় বাগানে কতই না সুস্বাদু ফল ফলত। কিন্তু ধীরে ধীরে বাগানের যত্নের ত্রুটি হতে লাগল এবং পরে বহু দিনের অযত্নের ফলে জঙ্গল ও আগাছা প্রভৃতিতে বাগানটা ছেয়ে গেল। এর পর একজন অতি বিশ্বস্ত মালীর অসীম যত্ন ও তদারকে যখন বাগানটা ফলে-ফুলে আবার সুশোভিত হয়ে উঠল, আগাছা দূরীভূত হয়ে যখন বাগানটা তার প্রথম যুগের সৌন্দর্যে বিভূষিত হল, তখন অধিকাংশ লোকই বলতে লাগল, এ বাগান যেন সে বাগান নয়—এটা

নূতন বাগান। ভুল বুঝা-বুঝির আসল কারণ এটাই। এখানে অন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি—একজন মালিকের একটি ঝ্‌কঝ্‌কে ইস্‌পাতের ছুরি ছিল। তা দ্বারা অনায়াসে সব কাটবার যোগ্য জিনিসই কাটা যেত। মালিকের খাদেমরা ছুরিটাকে মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প ধার দিয়া তা দ্বারা কাটাচিরার কাজ করত। চাকর আসে, চাকর যায়। কেউ, ছুরিটার যত্ন নেয়, কেউবা ছুরির বুকটা (edge) সামান্য ধার দিয়ে কোনরূপে তা দ্বারা কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়। এম্‌নি করে বহু বছর যেতে যেতে ছুরিতে অনেক মরিচা ধরে যায়। তবুও কোনরূপে কাটার কাজটা চলে। এই সময়ে একজন নূতন খাদেম প্রভু দ্বারা নিযুক্ত হয়। সে অতিশয় প্রভুভক্ত ও কর্তব্য পরায়ণ। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ছুরিটাকে অতি যত্নে পরিস্কার করতে থাকে সকলের অদেখায়। এমনি করে ধীরে ধীরে ছুরির সমস্ত মরিচা দূর করে চক্‌মকে ঝক্‌মকে ছুরিটা সে গৃহবাসীদের সামনে একদিন উপস্থিত করে বল্‌ল, এটা তার প্রভুর পুরানো ছুরি। একথা শুনামাত্রই গৃহবাসীরা চেঁচিয়ে উঠল, "এটা আমাদের ছুরি? কখনো হতে পারে না। বেটা নিশ্চয় ঠক; কার ছুরি চুরি করে এনেছে। বেটা চোর, এখান থেকে বের হয়ে যাও" প্রভুভক্ত চাকর সব খুলে বলতে চাইল, কিন্তু গৃহবাসীদের সমস্বরে "যাও" "যাও" শব্দের তলে সব তলিয়ে গেল। এই হলে ইসলামের সেই ধারাল ছুরি, যার যত্ন নিতে গিয়ে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হলেন।

ইহাই ধর্ম-জগতের পরিহাস। ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই বহন করে। হযরত ঈসা এসে ইহুদীদিগকে তৌরিতের মূল শিক্ষায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। তৌরিত ইহুদীদেরই ধর্মগ্রন্থ। তথাপি ইহুদী মৌলানাগণ হযরত ঈসাকে আমল দিলেন না, বরং তাকে হত্যা করার চেষ্টায় লিপ্ত হলেন। পরিশেষে ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থা হতে প্রাণে রক্ষা পেয়ে হযরত ঈসা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। হযরত ঈসা মাতৃভূমি হতে চিরতরে বিতাড়িত হলেন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এসে আহ্‌লে কেতাব, ইহুদী ও ঈসায়ীদের ধর্ম পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে, তাদের কাছে নিজের রেসালতের (রাসুল হওয়ার) দাবী পেশ করলেন। কিন্তু তাদের আলিমগণই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল সর্বাগ্রে। সাধারণ লোক এক দুই করে তাঁকে গ্রহণ করলেও ইহুদী ও নাসারা মৌলানাদের উস্কানীতে তাঁকে দেশ ত্যাগী হতে হয়েছিল। অতএব ইমাম মাহ্‌দী যে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার হাতে নির্যাতীত, নিপীড়িত ও পরিত্যক্ত হবেন, তা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মতই অবধারিত ছিল।

আসল কথা হল এই যে, হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইসলামের দেহে সঞ্চিত, প্রক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত অনেক নিয়ম-রসূম যথা—পীর-মুরিদী, ফকিরী, কবর পূজা ও গতানুগতিকতা ইত্যাদিকে অবাঞ্ছিত ও হানিকর আবর্জনা জ্ঞানে ঝাঁঝাল কষ্টিক সোডা দ্বারা ধুয়ে মুছে দেন। বিধৌত ইস্‌লামের বাহ্যিক চাক্‌চিক্য তাতেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। এই বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে ইস্‌লামের যে আত্মা অবগুণ্ঠিত অবস্থায় ছিল, তিনি তা উন্মোচন করে এমনি

হৃদয় গ্রাহী করে দুনিয়ার সামনে পেশ করলেন, যার তুলনা ইসলামের ইতিহাসে আর নেই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ না করেও একথা স্বীকার করেছিলেন।

স্থান-কাল ও পাত্রের তারতম্য বশতঃ ইসলাম ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই হউক আর ধর্ম্মীয় দর্শনের বিভিন্নতার কারণেই হোক মুসলিম জাহান কতকগুলি সম্প্রদায়ের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল। আচার অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতাই ধর্মের স্থান গ্রহণ করে ফেলেছিল। ইসলামের বিশ্বমানবতা, পবিত্রতা মঙ্গল-মুখীতা প্রভৃতি ধূলায় মিশে গিয়েছিল। হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইসলামের অন্যতম মূল্য বোধক শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন এবং ইহার জীবন দর্শনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। প্রকৃত ও মূল ইসলামের উপর সকলকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। শতধা বিভক্ত মুসলিম সম্প্রদায়গুলির পরস্পর বিরোধ ইসলামের মূলশিক্ষার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করে তাদেরকে এক করাই ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। এবং এই ঐক্য মারফত সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় সাধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ লক্ষ্য যে বিরাট ধর্মীয় মহাপুরুষেরই হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে কি? হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এরূপ মহাপুরুষ হবারই দাবী করেছেন। হাদিসেও এরূপ মহাপুরুষের আগমন বার্তা আছে। সেখানে তাঁকে ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডকতা হতে মুক্ত করে ইসলামকে তার অবতরণকালীন পূর্ণ উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছলতা ও সৌন্দর্য সহকারে দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করেন। কোরান, হাদিস এবং সুন্নাহ্‌ই তার প্রচারিত ইসলাম। "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল্লাল্লাহ্" কলেমার অনুসারী তিনি। রাসুলে রাব্বিল আলামীনের বিশ্বাসী গোলাম ও ভক্ত বলে পরিচয় দেওয়াতেই তিনি গৌরব বোধ করতেন। তবুও অজ্ঞতা বশতঃই হোক, ঈর্ষাজনিত কারণেই হোক অথবা ভুল বুঝার কারণেই হোক, মুসলমান সম্প্রদায়গুলি তাঁর প্রদর্শিত আদত ইসলামকে একটা নূতন মত মনে করে, তাঁর অনুগামীদের একটা পৃথক সত্বায় পরিগণিত করলেন। একথাও ঠিক যে বিশ্বজুড়া খ্রীষ্টানী প্রাধান্যের এই যুগে বিশ্ববাসীকে ইসলামের একই ঝাণ্ডার তলে সমবেত করার মত বিরাট উদ্দেশ্য যাদের থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যে যারা জান মাল কোরবান করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হয়, তারা সংখ্যায় কম হলেও যে পৃথক সত্বার অধিকারী হবে; একথা বলারই দরকার পড়ে না। কাজেই না চাওয়া সত্বেও তাদের একটা পৃথক সত্বা হাসিল হয়ে গেছে। সকলকে এক করতে গিয়ে, আহ্‌মদীগণের নিজেকেই অনেকটা একঘরে হতে হল। একি তাঁদের এই সহানুভূতি সম্পন্ন ঐক্য প্রচেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি, না বিশ্ব নিয়ন্তার সক্রিয় বাসনার পরিস্ফুটন, এ প্রশ্নও অনেক সময় মনে আন্দোলিত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পাই যে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে একাগ্রতা, কর্ত্তব্যবোধ ও মনোবল রক্ষার্থে যেমন প্রাণোৎসর্গকারিসৈনিকগণ সাধারণ জনগণ হতে পৃথক জীবন যাপন করে থাকে, আল্লাহ্‌র পক্ষে উৎসর্গী-

কৃত ইসলামের সিপাহীদের ঈমান, নির্ভিকতা, সততা ও কর্তব্য পরায়ণতা রক্ষার্থেই হয়তঃ আল্লাহ্ তাদেরকে জনসমুদ্র হতে পৃথক করে রেখেছেন। বিভক্ত মুসলমানকে একত্র করা ও সারা বিশ্বকে মুসলমান করার বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য খোদার সৈন্য হিসাবে আহ্মদীদের আপাততঃ পৃথক থাকার প্রয়োজন আছে। তবে, সৈনিকরা পৃথক শিবিরে থেকেও যেমন মূলতঃ জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তেমনি আহ্মদীগণের পৃথক শিবির থাকা সত্বেও তারা ইসলামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

●

রমযান মাসে

সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযান অন্যতম। রোযা রেখে প্রকৃত পক্ষে যারা আত্মশুদ্ধি আনয়ন করেছে তাদের পুরস্কারের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্-তা'লা জামিন হন।

পবিত্র কোরান মজিদে রমজান-আল-মোবারক সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেছেন: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য যেমন রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, তোমাদের উপর সেইরূপ বিধিবদ্ধ করা হলো, যাতে সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পার।"—(সুরা বকর)। কোরান করীমের উল্লিখিত উক্তি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এই রোযা বা উপবাস ব্রত কোন নূতন বা অভিনব বিধান নহে। এই উপাসনা পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের একাদশী, শিব রাত্রি, জৈনগণ পর্য্যুসন প্রভৃতি পালন করে থাকেন। হযরত মুসা (আঃ) চল্লিশ দিবারাত্র সিনাই পর্বতে সদা প্রভুর সহিত অবস্থান করেছিলেন, এবং রোযা রেখেছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) বিজন প্রান্তরে চল্লিশ দিবারাত্র উপবাস করে দিয়াবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের রোযা ও অন্যান্য ধর্মের রোযায় বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল বিপদাপদ শোক দুঃখের সময়েই নিভৃতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র করুণা লাভার্থ উহা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু ইসলামের রোযা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ অবস্থার উন্নতির দরজা খোলে দিয়েছে। "লা আল্লাকুম তাত্তাকুন"—"যা'তে তোমরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পার।" ইসলামের রোযা কেবল পানাহার পরিত্যাগ জনিত ক্লেশ ভোগ নহে। উহা মানুষকে অন্তরাত্মার চরমোৎকর্ষ লাভের দিকে পরিচালিত করে। রোজার প্রভাবে তারা বৈধ পানাহার পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হয়ে আত্মসংযম লাভের অধিকারী হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপুর সাথে যুদ্ধ করে উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। চক্ষুকর্ণাদি রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়

ও প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পাপাচার থেকে বিরত রেখে পবিত্র দেহে ও পবিত্র হৃদয়ে রোযা পালন করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন : "রোযা রেখে যে ব্যক্তি কুবাক্য ও কুকর্ম পরিত্যাগ না করে, সে পানাহার পরিত্যাগ করলেও খোদা-তা'লা তার কোন পরওয়া রাখেন না।" অনেকেই রোযা রাখেন ; কিন্তু উহার মর্ম বুঝেন না। রোযার উদ্দেশ্য যে কি তার কোন খোঁজ-খবরই রাখেন না। বাপ-দাদারা রোযা করে গেছেন তাই তারাও করেন। রমযান মাস পবিত্র, খোদার বাণী পবিত্র, নবী ও রসুল পবিত্র, ইহাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা পবিত্র হয়ে বাঞ্ছিত ফল লাভের চেষ্টা না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু উপবাস করাতে এই উদ্দেশ্যহীন রোযা পালন করা আমাদের কোন কাজেই আসবে না। মানুষ প্রকৃতির দাস। সে তার প্রবৃত্তিকে যে ছাঁচে ঢালবে তারই আকার ধারণ করবে। ভাব ও কুবাসনার প্রশ্রয়ে মানুষ পরিণামে শয়তানের আকার ধারণ করে। আর সুভাব ও সুমতি মানুষকে ফেরেস্তার চেয়েও উন্নত করে। যারা রমযানের পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করে উহাতে দেহ মন ঢেলে দেয় কেবল তারাই লাভবান হয়। ফলতঃ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভই রোযার প্রধান উদ্দেশ্য। রোযা প্রসঙ্গে আল্লাহ্-তা'লা বলেছেন : (রোযা) নির্দিষ্ট কতিপয় দিবসের জন্য ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়াগ্রস্ত বা প্রবাসী হলে সে অন্য সময় নির্দ্ধারিত দিবসের রোযা রাখবে এবং (পীড়িত ও প্রবাসীদের মধ্যে) যাদের ক্ষমতা আছে তারা প্রত্যেক রোযার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একজন দরিদ্রকে অন্নদান করবে। পরন্ত যে ব্যক্তি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সৎকর্ম করে তার পক্ষে উহা অধিকতর মঙ্গলদায়ক। এবং তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তোমরা বুঝবে (এমতবস্থায়) রোযা রাখাই ভাল। রমযান মাসেই কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। (এই কোরান) মানবের পথ প্রদর্শক, উপদেশ (সত্য হতে শিক্ষার)ও বিভিন্নতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং তোমাদের যে কেহ রমযান মাস পাবে তোমরা তখন রোযা রাখ। রুগ্ন বা প্রবাসী হলে অন্য সময় রোযা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা আয়াস সাধ্য তাহাই কামনা করেন, যাহা কষ্ট সাধ্য তাহা ইচ্ছা করেন না। তিনি ইচ্ছা করেন যে. তোমরা (রোযার) সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তজ্জন্য তাঁর মহাত্ম্য ঘোষণা কর এবং কৃতজ্ঞ হও। রোযার রজনীতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ। নারীগণ তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ সদৃশ। প্রত্যুষে রজনীর কৃষ্ণরেখা দিবসের শুভ্র রেখা থেকে প্রভেদ না হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর। তৎপর রাত্রি না আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। মসজিদে এতেকাফ করার সময় (রাত্রেও) স্ত্রী সহবাস করো না। মানবগণ যাতে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে সেইজন্য আল্লাহ্ এইরূপে তাঁর বিধি নিষেধ তা'দিগকে পরিজ্ঞাত করালেন, যেন তারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে।—(বকর)। আল্লাহ্-তা'লার এই সব উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাকওয়া বা সাধু জীবন গঠন করাই রোযার মুখ্য উদ্দেশ্য। রোযার সময় প্রচলিত ফরজ নামাজ ছাড়াও তারাবি—তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার প্রথা আছে। নবী করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশদিন এতে-

কাফ অর্থাৎ মসজিদে অতিবাহিত করতেন। এই সময় নফল নামাজ, দোওয়া-দরুদ, কোরান পাঠ প্রভৃতি উপাসনায় নিমগ্ন থেকে খোদা-তা'লার সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের আমল তার নিজের জন্য; কিন্তু রোজা আল্লাহ্‌র জন্য এবং উহার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্-তা'লা। রোযা ঢাল স্বরূপ। যদি তোমাদের কারো রোজার দিন হয় অর্থাৎ রোযাদার হয় তবে কোন অশ্লীল এবং অনর্থক কথা বলবে না। যদি কেহ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করতে চায় তবে বলবে, আমি রোযাদার। ঐ পবিত্র অস্তিত্বের কছম যাতে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রাণ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্-তা'লার নিকট মেশ্‌কের (মৃগনাভীর) চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য আনন্দ দুই প্রকার। প্রথমতঃ যখন তারা রোযা খোলে তখন তারা আনন্দ অনুভব করে; দ্বিতীয়তঃ যখন তারা তাদের সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করবে।" –(বোখারী)। কোরান মজিদের "লায়লাতুল কদর" সম্মানিত রজনী নামক সুরায় এমন এক রজনীর উল্লেখ আছে যে, সেই রজনীর পূণ্য সহস্র রজনীর পূণ্যাপেক্ষা অধিক। সেই পবিত্র রজনীও রমযান মাসেরই শেষ দশ রাত্রিতে হয়ে থাকে।

আল্লাহ্-তা'লা বলেছেন ঃ—"হে মোহাম্মাদ! এবং যখন আমার দাস তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তখন আমি নিশ্চয়ই খুব নিকটে (যখন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই) সুতরাং আমি যখন তা'দিগকে ডাকি, তারাও যেন আমার ডাকে উত্তর দেয় এবং আমাতে বিশ্বাস করে সৎপথে পাদচারণ করে।" —(বকর)। রমযান মাসেই দয়াময় আল্লাহ্-তা'লা তাঁর অনুগ্রহের দ্বার খুলে দেন, যে কেহ শুদ্ধচিত্তে তাঁর দ্বারে লুটায়ে পড়েন, দয়াময়ের কৃপাহস্ত তারই জন্য প্রসারিত হয়।

★

খেলাফত ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ

মোহাম্মাদ বদিউজ্জমান ভুঞা

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও খেলাফত ঃ যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া মানবের সৃষ্টি, উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত যদি না মানব জাতির একটা বড় অংশ কোন আধ্যাত্মিক বৃত্তকে নিজের ধর্ম্মীয় কেন্দ্রস্থল বলিয়া গ্রহণ না করিত। মানুষ যদি ধর্মীয় আনুগত্য স্বীকার না করিত, তাহা হইলে সে স্রষ্টার একত্বের মহিমা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত না।

সৌর জগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্ররাজি যেরূপ সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আপন আপন কক্ষে ঘুর্ণেয়মান থাকিয়া এক মহান দায়িত্ব পালন করে ও স্বকীয়তা বজায় রাখে মানব মণ্ডলীও তদ্রূপ সমসাময়ীক সুযোগ্য নেতার পরিচালনায় এক সবল সংগঠনে একত্রিত হইয়া আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করতঃ এই মরজগতকে

স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে পারে। এরূপ সুযোগ্য ধর্ম্মীয় নেতাকে ইসলামিক পরিভাষায় "খলিফা" বা এমাম ও তদীয় প্রতিষ্ঠানকে খেলাফত বলে।

কোরানে তিন শ্রেণীর খলীফার উল্লেখ :— কোরান করীমে আল্লাহ্-তা'লা তিন প্রকার খলিফার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ নবীগণ আল্লাহ্-তা'লার খলিফা, তাঁহাদের মারফত পৃথিবীতে আল্লাহ্-তা'লার গুণাবলীর বিকাশ হয়, যথা— হযরত আদম (আঃ) ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর উল্লেখ। দ্বিতীয়তঃ এক জাতির পতন বা ধ্বংশ হইলে আল্লাহ্-তা'লা অন্য জাতিকে তাহাদের স্থলবর্ত্তী করেন, পরবর্ত্তী জাতি ধ্বংশ প্রাপ্ত জাতির খলিফা, যথা—নুহ (আঃ)এর কউম ধ্বংশের পরে হুদ (আঃ)-এর কাউমের উত্থান, আদ জাতির পতনের পরে ছামুদ জাতি তাহাদের স্থলবর্ত্তি, বা খলিফা হওয়ার ইতিহাস।

তৃতীয়ত :—নবীর মৃত্যুর পর বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার উম্মতদের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিকেও খলিফা বলা হইয়াছে। কারণ এরূপ খলিফা তদীয় ধর্মগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার দেওয়া শরিয়তকে জগতে প্রচার করেন এবং স্বধর্মীয়দের মধ্যে একত্ব ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোক বিতরণ করেন।

খলিফা ত্রিবিধ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। যথা (ক) শরিয়তধারী নবীর তিরোধানের পর তাঁহার উম্মতগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ধার্মিক ব্যক্তিকে উপস্থিত জনগণ নির্বাচন করেন। যেরূপে বিশ্বনবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরে তাঁহার উত্তম সহচরদের মধ্যে পর পর হযরত আবুবকর, উমর, উছমান ও আলী (রাঃ) খলিফার পদে বরিত হইয়াছিলেন।

(খ) নবী নিজেও তাঁহার খলিফা মনোনয়ন করিতে পারেন, যেভাবে হযরত মুছা (আঃ) কোহ্তুরে যাইবার সময় নিজেই হযরত হারুনকে খলিফা মনোনয়ন করিয়াছিলেন।

(গ) খোদা-তা'লা স্বয়ং এক নবীর অবর্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শরিয়তকে খাঁটী রঙ্গে চালু রাখিবার জন্য নবীর অনুগামীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করেন। উক্ত খলিফা নবুওতের মর্যাদালাভ করিয়া পতনোন্মুখ জাতিকে নবচেতনা দান করতঃ এক সুসংহত ধর্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এবম্বিধ কতিপয় খলিফা মুছায়ী শরীয়তের অধীন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মোহাম্মাদী শরিয়তাধীনেও ইতঃপূর্বের মোজাদ্দেদগণ ও বর্তমান শতাব্দীতে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-কে প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য মোমেনগণ লাভ করিয়াছেন। আল্হামদুলিল্লাহ্।

খেলাফতের সপক্ষে আল্লার বাণী :— খোদা-তা'লার অনুগ্রহ ও ইচ্ছায়ই খলিফা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সনাতন নীতির সপক্ষে আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরানের প্রারম্ভেই খেলাফত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা, ইহার গুরুত্ব এবং স্বধর্মীয়দের প্রতি খলিফার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলার আদেশ, খলিফার বিরোধিতা করিতে নিষেধ, এবং খলিফার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সমগ্র মানবজাতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।—সুরাহ বাকারাহ।

ফেরেস্তারা যেরূপ বিনাদ্বিধায় আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করেন, অনুরূপভাবে মোমেনগণেরও তদ্রূপ

সমসাময়িক খলিফার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলা কর্তব্য। আল্লাহ্‌র খলিফা আদম (আঃ)-কে মানিতে অস্বীকার করিয়া, ইবলিস্‌ ও তাহার দল যেভাবে আল্লার বিরাগভাজন হইয়াছে, সমসাময়িক খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মুসলমান-দেরও তদ্রূপ অধঃপতনের আশঙ্কা বিদ্যমান। উক্ত আয়াত ইহাই নির্দেশ করে।

খেলাফতের মাধ্যমে ধর্মীয় উন্নতি :—স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লার খলিফার পতাকাতলে সমবেত হইয়া যুগে যুগে মানব জাতি অসাধ্য সাধন করিয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষী আমাদের সামনে বিদ্যমান। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ও তদীয় খলিফাদের এতায়াত করিয়া তৎকালীন মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মকে সফলতার সহিত বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উন্নতি সাধন ও সমস্যামুক্ত করিয়াছিলেন এবং খলিফার সংস্পর্শে আসিয়া বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ্‌-তা'লার নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে যখন মুসলমানগণ খেলাফত কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখনই তাহাদের একটানা উন্নতি রুদ্ধ হইয়া গেল। সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদেশের মুসলমান অন্য দেশের মুসলমানকে হিংসা করিতে আরম্ভ করিল এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিরেধ ও বিভেদর বীজ বপিত হইল। তাহারা শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য জাতির পদানত হইল। আরব, পারশ্য, তুরস্ক, মিশর, স্পেন ও ভারতের মুসলমানগণ যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় একদা একে অন্যকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, উহারাই আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া শত্রুতায় লিপ্ত রহিয়াছে। আজ যদি বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ, জাতি ও গভর্ণমেন্ট এক আধ্যাত্মিক কেন্দ্রীয় খলিফাকে মানিয়া চলিতেন তাহা হইলে পাকিস্তানের সহিত আফগান ভাইদের বিরোধ, ইরাকবাসীর সহিত কুয়াইতবাসীদের মতভেদ, মালয়েসীয়ার সহিত ইন্দোনেসীয় ভাই-দের ঝগড়া এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারিত না, কারণ, ইসলামের কেন্দ্রীয় খলিফাই সকল মতভেদ দূর করিয়া একতা সংস্থাপন করিতে পারিতেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী পর্যা-লোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে খেলাফত মুসলিম জাতির অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। খেলাফতের মাধ্যম ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে ইস-লামের উন্নতি সাধন, সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গঠন সম্ভবপর নয়।

ইসলামের খেলাফত বজায় রাখিতে আল্লার ওয়াদা :—পবিত্র কোরানে—সুরা নুরের ৭ম রুকুতে আল্লাহ্‌-তা'লা মোমেনদের মধ্যে যাঁহারা সৎকর্মশীল, তাঁহাদের মধ্যে খেলাফতের সিলসিলা কায়েম রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই খেলাফতের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের বিস্তার ও বিজয় লাভের কথা বলিয়াছেন :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف
الذين من قبلهم - وليمكنن لهم دينهم
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
امنا - يعبدوننى لا يشركون بى شيئا -
ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

অর্থাৎ "আল্লাহ্-তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা বিশ্বাসী ও সৎ-কর্মশীল তাহাদিগকে পৃথিবীতে তিনি অবশ্যই খলিফা করিবেন, যেরূপ খলিফা করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্ত্তীদের মধ্য হইতে এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের জন্য যে ধর্ম মনোনয়ন করিয়াছেন উহা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের ভীত হইবার পর তৎপরিবর্তে নিরাপত্তা বিধান করিবেন, (আল্লাহ্ বলেন) তাহারা আমার এবাদত করিবে এবং আমার সঙ্গে কোন শরীক করিবে না, তৎপরে যে কেহ অকৃতজ্ঞ, তাহারা হইবে অবাধ্যদের অন্তর্গত"। এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান দাতা ও দয়ালু আল্লা অতীতে খোলাফায়ে রাশেদিন, খলিফা ওমর এবনে আবদুল আজিজ, হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খলিফা করিয়াছিলেন। এবং এই যুগে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-কে মোহাম্মদী শরিয়তের মাহ্দী বা আধ্যাত্মিক খলিফা করিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠীত সিলসিলা অনুসরণকারীদের মধ্যেও খেলাফতের প্রতিষ্ঠান কায়েম রাখিবেন। এই আয়াতের পরবর্ত্তী আয়াতে আল্লাহ্-তা'লা খেলাফত কায়েম রাখিবার নিম্নোক্ত শর্ত রাখিয়াছেন, উহা মোমেনদের নিয়মিত উপাসনা, জাকাত দান এবং ধর্মীয় ও দুনিয়াবী সকল অনুশাসনে আল্লার রছুলের এতায়াতের উপর নির্ভরশীল, আমরা নামাজে দৃঢ়, জাকাত দানে নিয়মানুবর্ত্তী এবং রছুলের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অটল থাকিলে, আল্লাহ্ আমাদের মধ্য হইতে সকল জাতিকে আলোক ও জ্ঞানদান করিবার জন্য নেতা মনোনীত করিবেন এবং আমাদিগকে অন্য জাতি ও শত্রু কর্তৃক অত্যাচারিত বা পরাজিত হইবার আশঙ্কা হইতে মুক্ত রাখিবেন। আল্লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একদিন ইসলাম সমস্ত পৃথিবী শাসন করিবে, এবং সর্বোপরি আল্লার তৌহিদ ও একত্ব প্রকাশিত হইয়া ইসলামের আসল উদ্দেশ্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, যেহেতু মহামানব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-ই আজ হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত মানবতার একমাত্র পথ প্রদর্শক। তাঁহার খেলাফত রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অবিসম্বাদিত ভাবে বজায় থাকিবে। এখানেই হইল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর সহিত অন্যান্য নবীদের পার্থক্য এবং এখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্ব হযরত আহ্মদ (আঃ)-কে আমরা পাইয়াছি, আর তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া আল্লার শুকুর আদায় করিতেছি।

ইসলামিক খলিফার বৈশিষ্ট্য :—খলিফাদের বিশেষত্ব ও কার্য্য পরিক্রমা নিম্নরূপ—তাঁহারা ধর্মীয় আইনকে ভুল ব্যাখ্যা হইতে রক্ষা করেন, এবং ভ্রান্তদেরকে প্রভুর নিকট আসিবার আহ্বান জানান। সকল প্রকার ধর্মীয় বেদাত দূর করিয়া এক আল্লাহ্-তা'লা সৎকর্মশীল পবিত্র দল গঠন করেন। তাহারা খলিফার ডাকে, আল্লার রাস্তায় ধর্ম প্রচারে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, খলিফারা বিপদে, আপদে ভাঙ্গিয়া পড়েন না। সর্বাবস্থায় মানসিক স্থিরতা বজায় রাখেন ও কোন

রূপ পার্থীব বিরুদ্ধতায় চলার পথে উদ্যম হারান না! তাঁহারা এক আল্লার উপর নির্ভর করিয়া, নির্ভয়ে, নির্ভুল পরিকল্পনানুযায়ী ধর্মকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করিবার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)। আল্লার ওয়াদা অনুসারে আজ তাঁহার পরিচালনায় খাঁটি ইসলামের পয়গাম দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছান হইতেছে। আহ্‌মদী মোবাল্লেগগণ সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া ইসলামের ঝাণ্ডা, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে উড্ডিন করিয়াছেন। আল্লাহ্ আহ্‌মদী মুসলমানদের ঈমানকে দৃঢ় করিয়াছেন।

খলিফা একতার প্রতীক ও শক্তির উৎস :- মুসলমানরা এক আল্লার উপাসনা করে এবং এক ঐশি গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী এক মহামানব মণ্ডলীর এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাস করে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য এক মহান নেতার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। সকল দেশের ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্ব্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণকে এক সাধারণ যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রগতিশীল জাতিকে সঙ্গবদ্ধ করার জন্য এক সবল পবিত্র নেতৃত্বের প্রয়োজন। যেহেতু একতা সংহতি ও শৃঙ্খলা জাতির তরক্কির প্রধান উপকরণ, আবার স্থায়ী সংহতি একমাত্র সবল আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাধ্যমে গড়িয়া উঠে। এহেন গুণে গুণান্বিত খোদা ভক্ত নেতাই প্রকৃত খলিফা। এরূপ মহাপুরুষ সর্ব্বদা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহার আদেশ ও নিষেধ বিনা দ্বিধায় মানিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য। ইহার নামই বয়াত বা আত্ম বিক্রয়। অতীতে দেখা গিয়াছে, বহু মুজাহেদ বয়াত করিয়াই খলিফার ডাকে ইসলামের খেদমতে নিজের সর্বস্ব, এমন কি জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

মনিষী হযরত তাল্‌হা ও, জোবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবীদের ত্যাগের উদাহরণ অনেকেরই জানা আছে। এই যুগে হযরত খলিফা আওয়াল হেকিম নুরুদ্দিন (রাঃ) সাহেবের কোরবানী উল্লেখযোগ্য।

আজ আহ্‌মদীয়া জমাতের খলিফার পরিচালনাধীনে আহ্‌মদী মুসলিম মিশনারীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবন পণ করিয়া ইস্‌লাম প্রচারে সাফল্য অর্জন করিতেছেন। বিজাতীয় খৃষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী আক্রমণের সম্মুখীন হইয়া যুক্তি ও দলিলের সাহায্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, বিভিন্ন ভাষায় কোরান করীমের অনুবাদ করিয়া বিভিন্ন দেশে প্রচার ও বিতরণ করিতেছেন। এরূপ সুকঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ বিরাট কার্য পরিচালনা, কেবল আল্লার অনুগ্রহ প্রাপ্ত খলিফার দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। পৃথিবীতে কত রাজা, কত আমীর ওমরাহ, কত কোটিপতি, কত টাইটেলধারী মাওলানা অতীত হইয়া গিয়াছেন, এবং আজও বর্তমান আছে, ইসলামের প্রতি ইহাদের দরদেরও অভাব নাই। কিন্তু কেউ কি আহ্‌মদীয়া জমাতের বর্ত্তমান খলিফার ইসলাম প্রচারের কার্য্যে সাফল্যের তুলনায়

সহস্রাংশের একাংশ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিতে পারিবেন? তাহাদের অসাফল্যের কারণ আল্লার মনোনীত খলিফার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ না করা। সুতরাং খেলাফত ইসলামের অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বীকার করিতেই হইবে। খেলাফত মোমেনদের প্রতি আল্লার নেয়ামত, ইহার মাধ্যমে জাতির সংযোগ, একতা ও তরক্কী রক্ষিত হয়। খলিফার এতায়াতে ব্যক্তিগত জীবনে রুহানী তরক্কী ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্মীয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সাধন সম্ভবপর।

নেতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের উপকারিতা :—খেলাফত প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় পেশ করা জরুরী মনে করি। সর্ব্বাবস্থায়, সমবেত ভাবে খলিফার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যদান নেতার পদক্ষেপ সুদৃঢ় করে, এবং পরিকল্পনানুযায়ী প্রগতিশীল কার্য চালাইয়া যাইতে নেতাকে সাহায্য করে। অনুগামীরা যদি বিশ্বস্ত না হয়, সময়মত নেতার ডাকে 'লাব্বাএক' বলিয়া সাড়া না দেয়, তাহা হইলে নেতাও সাফল্য জনক ভাবে পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন না।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে এবং ছোট বড় পরিবারে সুযোগ্য নেতৃত্বের ও সুসংহত আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রত্যেক পরিবারে পিতার আদেশ পুত্রগণ, মাতার উপদেশ কন্যারা, বড়র উপদেশ ছোটরা মানিয়া চলিলে পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে, এবং সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে পরিবারে পুত্রেরা পিতাকে মানে না, কন্যাগণ মাতার বাক্য অবহেলা করে, ছোট বড়কে সম্মান করে না, তথায় সর্ব্বদা অশান্তি বিরাজ করে, পরিবারটি ঝগড়া কলহে জর্জ্জরিত হইয়া ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়। তাই প্রতি প্রতিষ্ঠানেরই যেরূপ এক সুযোগ্য চালকের আবশ্যক, তদ্রূপ প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে, অনুগত্য, নিয়মানুবর্ত্তীতা আবশ্যক। যে প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, যথায় অনুসারীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেখানে শান্তি ও উন্নতি অব্যাহত। যথায়, বিদ্রোহ, কলহ ও বিশৃঙ্খলা সেখানে উন্নতি রূদ্ধ ও ধ্বংশ অনিবার্য্য।

তাই ইসলামে খলিফা ও নেতার প্রতি আনুগত্যের জন্য আল্লার আদেশ লক্ষ্য করুন :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
واطيعو الرسول والى الامر منكم -

ছুরা নেছা, ৮ রুকু :-

সুতরাং খলিফার সাহচর্য্যে এবং এতায়াতে আল্লার নজদিক হইতে এলমে এরফান লাভ করিয়া খলিফার আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া সমগ্র জাতির খেদমতের যেরূপ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়, সেই সুযোগ সুবিধা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে লাভ করা যায় না।

আল্লার মনোনীত খলিফার অবাধ্যতা করিলে, আদমকে অমান্য করিয়া ইবালিসের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, মুসলমানদেরও তদ্রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

খলিফার হস্তে বয়াত করিয়া যে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, সে সৎকার্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া

উহা ভঙ্গকারীর কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। কারণ, সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীও শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক হাদিস অনুযায়ী "যে কেহ তাহার বয়াতের অঙ্গীকার পালন না করে, রোজ হাসরে আল্লার হুজুরে তাহার কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।" জামানার ইমামের বয়াত না লইয়া মরিলে সে মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর তুল্য।—সহি মুসলিম। অতএব খলিফার প্রতি পূর্ণ অনুগত্য রাখা ফরজ; আসুন, আমরা ইহা অনুধাবন করি, এবং আমাদের বয়াতের শর্তগুলি পুরাপুরি পালন কারিয়া ১ম শ্রেণীর মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত হইতে চেষ্টা করি, আসুন আজ আমরা আমাদের ইমান ও অনুগত্যের দৃঢ়তার জন্য আল্লার হুজুরে প্রার্থনা করি। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল্ হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

●

বিজ্ঞান ও ইসলাম

মকবুল আহ্‌মদ খান

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই আমাদের ধারণা, যা বিজ্ঞান সম্মত তা গ্রহণযোগ্য; আর যা বিজ্ঞান সম্মত নহে তা বর্জ্জনীয়। এ ধারনার বশবর্ত্তী হয়েই, গত এক শতাব্দী ধরে ধর্মকে বিজ্ঞানের চুল চেরা বিচারের কাঠ গড়ায় ঢুকানো হয়েছে। এ প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করব যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের কেহ বাদীও নয়, কেহ বিবাদীও নয়। আর এও দেখবেন যে, এর বিচারে সাক্ষীরাই হাকিম ও উকিল সেজে বসে গেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও প্রকৃত ধর্মের মাঝে কোন বিরোধ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারে মানুষের ধ্যান ধারণাতে এক বিশ্ব জোড়া বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজ জীবনের এমন কোন অঙ্গ বাকী থাকে নি যা বিজ্ঞানের প্রশ্নবান ও আঘাত হতে রেহাই পেয়েছে। ইউরোপের উনবিংশ শতকের শিল্প-বিপ্লব জীবন স্রোতে এক মহা পরিবর্তন সূচনা করে নূতন ঢেউয়ে সবাইকে ভাসাতে থাকে। ধর্মের নামে অত্যাচার, অবিচার এবং অযুক্তির অবসানও এ বিপ্লবের পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। কেন না, ইতোমধ্যে ধর্মও কক্ষ-চুত হয়ে দিগ্-বিদিগ্ শূন্য অবস্থায় কতকগুলি অলীক ধ্যান-ধারণা ও আচার পালনে সীমিত হয়ে, আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের কুপমণ্ডুকতা, অধর্মের চেয়েও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করেছিল। ধর্মের আসল প্রাণবস্তু উদারতা, মহানুভবতা, ভালবাসা, সহানুশীলতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবন হতে বিদায় নিয়েছিল বললেও অতুক্তি হয় না। ধর্মীয় ঐতিহাসের পূর্ব স্মৃতিও মানুষের মনে পীড়া দিতেছিল। সে ইতিহাস বেদনার ইতিহাস। নূতন আবিষ্কার

ও নূতন চিন্তাধারার জন্য আগেকার অনেক বিজ্ঞানী ও মনিষীরা ধর্মজাযকের হাতে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। ধর্মীয় শাসনের নামে তাঁদেরকে হত্যাও করা হয়েছিল। কাজেই ধর্মের সঙ্কীর্নতা ও গোড়ামী হতে বিবেককে মুক্ত করার সংগ্রাম মানুষের মনে যে দানা বেঁধেছিল, বিজ্ঞানের সহায়তায় তা খুব প্রকট হয়ে উঠল। ধর্মের প্রতিটি অঙ্গকেই তখন বিজ্ঞানের প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হলো। সে স্রোত আজও চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞান যে সব প্রশ্ন তুলে ধর্মকে কোন ঠাসা করছে বলে মনে করে, সে সব প্রশ্ন ধর্মের মূল বস্তুর উপরে কমই ছিল। বরং বিভিন্ন কুসংস্কার পৌরাণিক কাহিনী, আচার অনুষ্ঠান ও গোড়ামী ইত্যাদিই ছিল এই প্রশ্নবানের লক্ষ্যস্থল। সে সব প্রশ্ন বিকৃত ধর্মের মূলেই কুঠারাঘাত হানতে পারে। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ঐ সব প্রশ্নাবলী বরং সহায়ক হয়েছে। কেননা বিজ্ঞানের মত ইসলামও বিবেকের মুক্তি, যুক্তির প্রাধান্য, স্বাধীন চিন্তা এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের উর্দ্ধস্থান স্বীকার করে। শুধু স্বাকার করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং মানবীয় মূল্যবোধ এবং চিরসুন্দর ও চির-সত্যের পরিচয় লাভের জন্য, উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারকে ইসলামই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয়, ইসলাম উদারভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল বলেই এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে বিকৃত ধর্মের গোড়ামী হতে মুক্ত করেছিল বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মুসলমানেরা নবম ও দশম শতাব্দীতে সারা ইউরোপের শিক্ষকতা করেছিল এবং তারই ফলে ইউরোপের অন্ধকার ভূমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর শিখা জ্বলে উঠেছিল। পরবর্তী কালে ইউরোপের বিজ্ঞানমুখীতা, নব জাগরণ ও নব সভ্যতা যে মুসলমানদের শিক্ষকতারই ফল, তা কে অস্বীকার করতে পারবে? বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে পাপ-পূণ্যের প্রশ্নও আসত না। আদমকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে যে স্বাধীন শক্তি তাঁহার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল, জ্ঞানের আলোকে তার সদ্ব্যবহার করাই ছিল কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণ ও উজ্জ্বল আলোকে তার ব্যবহার করতে না পারায় তিনি নিজের বিবেকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হন। বিবেকের দংশনে তাঁর শান্তি ব্যাহত হয়। এটাকেই "বেহেস্ত হতে আদমের পতন" বলা যায় এবং রূপকভাবে গল্পকারে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞান, চিন্তা ও বিবেকের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারই ইসলামের নীতি। আর এর ব্যতিক্রমই শাস্তির কারণ। অথচ খৃষ্টান ধর্ম মতে আদমের শাস্তির কারণ নির্দ্ধারিত হয় "জ্ঞানবৃক্ষের" ফল ব্যবহারের জন্য। তাই খৃষ্ট ধর্ম তথা অন্যান্য ধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভয়ে থর থর করে কাঁপলেও, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহায়ক বন্ধু হিসাবে আদরে বরণ করে নেয়। কেননা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তাহা-দিগকে দূর দেশ ও প্রাচ্য প্রতিচ্যে গমনের তাগিদ করেছেন। যেমন :—

طلب العلم فريضة على كل مسلم
و مسلمة -

অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরজ।

আবার বলেছেন—

اطلب العلم ولو كان فى الصين -

অর্থাৎ সুদূর চীন দেশে গিয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ কর; আরও বলেছেন, "শহীদের রক্তের চেয়ে, জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি অধিকতর পবিত্র"।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপোষক এমন মহতী ধর্ম আর আছে কি? এখন ভেবে দেখুন, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ইসলাম এত আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তাকে ভয়ের চোখে দেখা কি কোন মুসলমানের শোভা পায়? আমার তো মনে হয় বর্দ্ধিত হারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার মাঝেই ইসলামের জগৎ ব্যাপী বিজয় সূচিত হবে।

এক্ষণে বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মের দু'একটি মূল দিক নিয়ে বিবেচনা করা যাক। পূর্বেই বলেছি ইসলাম আমাদেরকে কোন কিছুকেই অন্ধ বা বোকার মত বিশ্বাস করতে বলে না। দর্শন, শ্রবণ, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই বিশ্বাসে পৌঁছাবার উপদেশ দেয় এবং যদি সঠিক ভাবে এইগুলি সত্য প্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে তা দ্বারা সত্য উদ্ঘাটিত হবে বলে মনে করে। কিন্তু একটি কথা পূর্বাহ্নেই বলে রাখা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রাদি আমাদের সীমিত বুদ্ধি, বিবেচনা ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে আমরা যতই অসীম বলে মনে করি না কেন তা, সময়ের ও ব্যাপ্তির দিক দিয়া (time and space) অসীম নয়। অতএব সসীমতা দ্বারা অসীমতার বিবেচনার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে থাকেন। যেমন একটা নিম্নস্তরের সৃষ্টি উর্দ্ধস্তরের সৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, মানুষের ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। একটা মৃত্তিকা খণ্ড নিজের বুকে একটা বৃক্ষকে ধারণ করেও জানে না এ বৃক্ষের স্বরূপ কি? যে গরু সেই বৃক্ষের ছায়ায় সারাদিন কাটাল, বৃক্ষ তার পরিচয় পায় নি, আর যে মানুষ সেই গরুকে প্রতি পালন করে, গরু সেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কি?

তাই আমরাও যদি নিজের সীমিত শক্তি দ্বারা সময় ও ব্যাপ্তির অতীত আদিহীন ও অন্তহীন স্বয়ম্ভুর হেক্‌মত সম্যক উপলব্ধি করতে না পারি, তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? বিজ্ঞানের প্রাপ্ত শক্তিগুলি সীমিত জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, তার কোনও কোনটি অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটায় এবং পরবর্তি কালে তার পরিবর্তনও ঘটে। সদ্য প্রাপ্ত সত্যের সংঘাতে পুরাতন বৈজ্ঞানিক সত্য, যা একদিন সুনিশ্চিত বিবেচিত হত, তাও ধ্বসে পড়ে। বৈজ্ঞানিক টলেমীর পৃথিবীকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড পরবর্তীকালে অন্য বৈজ্ঞানিক কোপার নিকাসের (copernicus) কাছে সৌরকেন্দ্রিকে পরিণত হয়। অতএব বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ ও দার্শনিকের ক্ষুরধার যুক্তিই যে সুনিশ্চিত, চির সত্য লাভের একমাত্র উপায়, বলা উচিত হবে কি? ইসলামের ভিত্তি অপরিবর্তনীয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, চির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "ইসলাম" নামই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যান্য ধর্ম নিজের জন্য

প্রবর্তকের নামকে বরণ করে নিয়েছিলো, যেমন খৃষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জরতস্ত ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রবর্তিত ধর্ম "ইসলাম" নাম বরণ করে দেশ-কাল পাত্রের ভেদাভেদ থেকে নিজেকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছে এবং পূর্ববর্তি সকল দেশের ও সকল ধর্মের আসল সত্যকে নিজের বক্ষে ধারণ করেছে। এই ভাবে ইসলাম নিজকে সার্বজনীন ও সর্বকালোপযোগী করে তুলেছে। এর মাধ্যমে মানবতার ও সৃষ্টির একত্ব এবং ঐকিকতা ফুটে উঠেছে, যা অন্য কোনও ধর্মের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বিশ্ব-প্রকৃতি মূলতঃ এক। বিজ্ঞানের মতে তার নিয়মাবলীতে একটা ঐক্যের সূত্র রয়েছে। এই ঐক্যের সূত্রই অস্তিত্বের মূল নিদান। বিজ্ঞানের এই ঐক্য সূত্রের সহিত ইসলামের উল্লিখিত ঐক্য সূত্র কি আশ্চর্য ভাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অবিসংশ-বাদিত ঐক্য যে একজন একক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তারই ক্রিয়া নৈপুন্য, তা পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা সেটা বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে।

বিজ্ঞানের গণ্ডি, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সৃষ্ট বস্তু সমূহ ও তার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা করা। ইন্দ্রীয়াতীত অঙ্কের উপর বিজ্ঞানের অধি-কার নাই। তাই বিজ্ঞান তার অঙ্কের দ্বারা সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব স্বীকারে নিজকে কখনও লিপ্ত করেনি। সংশয় ও সম্ভাবনা এই দুইয়ের উর্দ্ধে বড় বড় বিজ্ঞানীরা কখনও পা ফেলেন নি। সৃষ্টি কর্তা সম্বন্ধে "না" বা "হা" এর মত সিদ্ধান্তে পৌছিবার অস্ত্রই তাদের কাছে নাই। তবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য ভেদ করে বৈজ্ঞানিকরা যে একটা ঐক্যকে আবিষ্কার করেছেন, তা হতে বুঝা যায় এই বিরাট সৃষ্টির পেছনে একজন একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার হাত রয়েছে, যিনি এই ঐকিকতাকে সৃষ্টি করে তা রক্ষনা বেক্ষন করেছেন, কেননা একক শক্তির বেশী শক্তি সৃষ্টির পিছনে কাজ করলে, অস্তিত্ব এতদিনে চুরমার হয়ে যেত। তাই ইসলাম সৃষ্টিকর্তার একত্বের উপর সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছে।

দৃশ্য ও অনুভূত বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞান চারটি স্তর করেছে—বস্তু জীবন, পশু-মন ও মানব-মন। জীবন বস্তুর উর্দ্ধে, মন জীবনের উর্দ্ধে, আর মানব মন পশু মনের উর্দ্ধে। নিম্নস্তর, উর্দ্ধ স্তরের কর্তৃত্ব করতে পারে না। তবে উর্দ্ধ স্তর নিম্ন স্তরের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। এই নীতিকে সম্প্রসারিত করে মানব মনের উর্দ্ধে যদি মানবাত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়, তাকে অভিজ্ঞতার অভাবে বৈজ্ঞানিকরা স্থির নিশ্চিত বলে স্বীকার না করলেও তা অযৌ-ক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক হবে না। কেননা পৃথিবীর সকল ধর্মই আত্মার উল্লেখ করেছেন এবং ধর্মপ্রাণ মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের উর্দ্ধে আত্মা ও তার বিভিন্ন স্তর ও প্রভা-বাদির উল্লেখ করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধ-তিতে আমরা বস্তু হতে জীবন, জীবন হতে মন, মন হতে আত্মা এবং এসব কিছুর উর্দ্ধে সৃষ্টি-কর্তাকে পেয়ে থাকি।

ধর্ম প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্তাকে পেশ করে। তারপর তাঁর সৃষ্ট আত্মা, মন, দেহ, প্রাণ ও প্রাকৃতিকে পেশ করে। ক্যাণ্ট ও স্পেন্সারের মতে দৃশ্য ও

অনুভূতির বাহিরে যে চরম সত্য বিরাজমান তা অপরিচিতই থাকবে—তার পরিচয় অন্বেষণ বৈজ্ঞানিকের কাজ নয়।

ধর্মের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছিল ডারউইনের ক্রমোন্নয়বাদ বা Evolution Theory. সৃষ্টিতত্ত্বে ডারউইনবাদ হল. 'পৃথিবী বহু পুরাতন। এ ছয় হাজার বৎসরেরও নয়; আর ছয় দিনের সৃষ্টিও এ নয়।' (অবশ্য আল্লার ভাষায় "ছয় দিনের" পরিমাণ যে কত আর তার প্রকৃত ব্যাখ্যা যে কি, ডারউইন বা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তা তলায়ে দেখেননি এবং এ ব্যাপারে তারা কোন মতামতও প্রকাশ করেননি।) যা হোক ডারউইনের মতে পৃথিবীর জড় বস্তু হতে আপনিতেই জীব-কোষ সৃষ্টি হয়ে ক্রমশঃ জীবন, তৎপর উচ্চস্তরের জীবন ও মন ইত্যাদি আপনা আপনি ঘটনাচক্রের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। সেখানে সৃষ্টিকর্তার কোনও কারসাজি প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর বুদ্ধিজীবিরা অবাক বিস্ময়ে এই আবিষ্কারকে এক মহা সত্য বলে গ্রহণ করল। ডারউইন অবশ্য নিজে ধর্মের উপর কোনও আঘাত হানেননি। বরং সৃষ্টির বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্যকে দেখে তিনি নিজেই সংশয়াভিভূত হয়ে ভাবতেন, প্রাকৃতিক 'নির্ব্বাচন ও জীবন যুদ্ধের ফলেই কি ময়ূরের পাখায় এই চাক্‌ চিক্য দেখা দিল?' ডারউইন নিজে না দিলেও তার থিওরী জগৎ হতে সৃষ্টিকর্তা ও তার ধর্মকে বিসর্জ্জন দিল। তথাপি আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ, বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকা সত্বেও খোদার অস্তিত্বে আস্থাবান আছেন।

বিজ্ঞান ও ধর্মের তুলনার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞান সার্বজনীন, প্রমাণযোগ্য ও প্রদর্শনযোগ্য এবং বিজ্ঞানের ফলাফল অনিবার্য; কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে বিশ্বে ঐক্যমত নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন সত্য পালন করে। কাজেই এতে অসত্য আছে। এ ধারণাও ভুল। ধর্ম মূলতঃ এক ও অবিনশ্বর। একথা ইসলাম সম্বন্ধে অতি জোর গলায় বলা যেতে পারে। কেননা কোরান ইসলামকে মোহাম্মাদ (সঃ)এর ধর্ম বলে বর্ণনা করে নাই। বরং ইসলামকে আদমের ধর্ম, নূহের ধর্ম, ইব্‌রাহিমের ধর্ম, মুসার ধর্ম, ইসার ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত নবীদের (আঃ) ধর্ম বলে আখ্যা দান করেছে। এমনকি পরিত্রাণকেও নিজের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই। কেননা ইসলামের খোদা "রাব্বুল আলামীন"। তিনি সর্বজনের। তাই কোরানে আছে, "এবং তারা বলে ইহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেহই পরিত্রাণ পাবে না। একথা তাদের কল্পনার কথা। তুমি জিজ্ঞাসা করো, এটা যে সত্য তার প্রমাণ কি?" প্রকৃত কথা এই যে, যে খোদার কাছে নিজকে উৎসর্গ করে এবং সৎকাজে ব্রতী হয়, সেই পুরস্কৃত হয়ে থাকে। তাহার ভয়ের কারণ নাই এবং সে দুঃখে নিপতিত হবে না। ইহুদীরা বলে খৃষ্টানগণ ভাল পথ অনুসরণ করে না। অথচ উভয়েই একই ধর্ম পুস্তক অনুসরণ করে। তাদের এই সব পারস্পরিক দাবী জ্ঞান 'বিবর্জিত। ইসলামের উদারতা ও সার্বজনীনতার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি কোরান থেকে —'যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা কিংবা সাবিয়া ধর্ম ভুক্ত, তাদের যে কেহ আল্লাকে বিশ্বাস করে, শেষ দিনে বিশ্বাস করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজ করে তারা পুরস্কৃত

হবে। তাদের কোন ও ভয় নাই এবং তারা দুঃখে নিপতিত হবে না।'

ইসলাম পূর্ববর্ত্তি সকল ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে এবং একক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট হিসাবে বিশ্বের জাতি গুলিকে যে ভাবে এক মানবতায় পরিণত হবার আহ্বান জানিয়েছে তার তুলনা অন্য ধর্মে নাই। ইসলামের এই এক-কেন্দ্রিকতা ও সর্বজনীনতা অতি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং তার সত্যতার পরিচায়ক।

বিংশ শতাব্দীর মনীষী লর্ড বার্নার্ড শ ইসলামের মহানুভবতা ও সর্ব্বজনীনতায় মুগ্ধ হয়ে ইহাকে eternal religion বলেছেন এবং বলেছেন ধর্মের মধ্যে শুধু ইসলামই টিকে থাকবার যোগ্য।

অলৌকিকতা বা মেজেজা ও ধর্ম পথে বিশ্বাসের অন্তরায়। প্রকৃতির মধ্যে অস্বাভাবিকতার কোনও স্থান বৈজ্ঞানিক মন স্বীকার করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা কি আমাদিগকে এইরূপ দৃশ্য প্রদর্শন করে না? প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের উপস্থিতিতে নিম্নস্তরের অবস্থিতির স্বাভাবিকতায় কিছু পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। যেমন এই মাটিতে একটি বীজ পুতে ঢেকে দিলেন। বীজ যখন জীবন সঞ্চারিত হয়ে গাছে পরিণত হতে চলে তখন সেই জীবন প্রাপ্ত চারাগাছ মাটির অবস্থিতিতে একটু পরিবর্তন ঘটায়ে মাটিকে সরিয়ে নিজে আলো বাতাসের দিকে এগিয়ে আসে। জীবনের আগমনে জড়ের মধ্যে একটা সাময়িক পরিবর্তন হলো বৈকি। মনো জগতের উর্দ্ধেকার আত্মিক জগতের সেইরূপ পরিবর্তনকারী প্রভাবে এম্নিতরো ইহজগতে আংশিক ও সাময়িক পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র কি? প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিকতার সাময়িক ও আংশিক পরির্তনই মোজেজা। ইহাও অবৈজ্ঞানিক নয়।

প্রকৃতি-জগতের সাথে নানা প্রকার গরমিল বিভিন্ন ধর্মে পাওয়া যায় বলেও অনেকে ধর্মকে হাস্যাস্পদ মনে করে। অন্য ধর্মের কথা না বলে, আমি শুধু ইসলাম সম্বন্ধে এই বলব যে, ইসলাম অতি প্রাকৃতিক ধর্ম। কেন না, ইসলাম, আমাদিগকে কোনও অস্বাভাবিক কিছুতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে না। প্রকৃতির মধ্যে আমরা যা দেখি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের যা দৃষ্টি গোচর হয়, তার বাহিরেও কত কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। অথচ এই বিরাট অস্তিত্বগুলির সবই একটি সাধারণ সূত্রে গ্রথিত অবস্থায় একই নিয়ম পালন করছে। এই ঐক্য সূত্র ও ঐক্য নিয়মই বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই প্রকৃতি-তত্বের ঐকিকতা, খোদার একত্বেরই পরিচয়। কোরান শরীফে ছত্রে-ছত্রে খোদা-তা'লা প্রকৃতিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য মানব জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। কেননা বৈজ্ঞানিক মন নিয়া প্রকৃতির বৈচিত্রকে যে বিচার করবে সে এই সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবিষ্কার করতে পারবে, যার ভিতর দিয়ে খোদার একত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কোরানে আছে—"ইন্না ফি খাল্‌কেস সামাওয়াতে .....ইত্যাদি", অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এবং পৃথিবীর বৈচিত্রময় সৃষ্টিতে এবং দিন-রাত্রির পরিবর্তনে, বুদ্ধিমানের জন্য যথেষ্ট সঙ্কেত নিহিত রয়েছে।.....

যাহারা গভীর চিন্তার সাথে এই সৃষ্টির প্রতি ধ্যান করে, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এই সৃষ্টি খেলার ব্যাপার নয় অর্থাৎ নিরর্থক নয় বরং অর্থপূর্ণ ও পরিকল্পনা পূর্ণ। সেই পরিকল্পনাকারীই খোদা।

বৈজ্ঞানিক ভাবে নীহারিকা (nabule) হতে সূর্য, তারকা, গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি এবং তাদের চলাফিরা একটা নিয়মের অধীন। সেই নিয়ম বৈজ্ঞানিকদের মতে যান্ত্রিক ও অন্ধ। বস্তুবাদীদের মতে এই নিয়ম কানুনে খোদার স্থান নেই। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক Eddington Jeans এবং হালডেনের দর্শন মতে, এই নিয়ম সৃষ্টি অঙ্ক মনা স্রষ্টার সাক্ষর বহন করে। ইমারসন ও কারলাইলের মতে, 'একটা ঘাসের পাতা সৃষ্টির জন্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই একত্র হয়ে সহায়তা করে। যে সব অবস্থার উপস্থিতি একটা বস্তুর সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় সেইসব অবস্থার সামান্য পরিবর্তনে, এই সৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে না। এই অবস্থাদিকে চালু রাখাও সংরক্ষণের জন্য একজন রক্ষকও দরকার। তাকেই কোরানে 'রব' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'রব' মানে সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা, বর্দ্ধন কর্তা, উন্নয়ন কর্তা ও সর্ববস্থায় রক্ষক।

ডারউইনবাদ পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক নয়। ডারউইনবাদ ক্রমোন্নয়নকে অর্থাৎ একস্তরের জীবের অন্যস্তরে রূপান্তরকে ঘটনা চক্র দ্বারা পরিবর্তন বলে মনে করে থাকে। অথচ ঘটনা চক্র বা Chance কথাটাই অবৈজ্ঞানিক। বস্তুবাদ ভাল-মন্দ মূল্য বোধ স্বীকার করে না। অথচ "Survival of the fittest"-এর মধ্যে fitness নিজেই একটা মূল্য বা সংগুণ। এই ভাবে Chance কে বিজ্ঞানে আমদানী করে ডারউইনবাদ অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। আবার 'fitness-এর মরণ নাই'—এই মূল্য স্বীকৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞানের রাজ্য ত্যাগ করে ধর্ম রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রকৃত পক্ষে, "Survival of the fittest" কথাটা ধর্মেরই অঙ্গীভূত। যারা আল্লাহ্-তা'লার নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং সৃষ্ট প্রকৃতির ঐকিকতার পরিপন্থী কিছু না করে, তাঁরাই বাঁচবার ও শান্তি পাবার যোগ্য। তারাই বেহেস্তী। অন্যদিকে যারা প্রকৃতির একত্বের (Unity-uniformity and regularity) পরিপন্থী কাজ করে, তারাই শাস্তি পাবার যোগ্য; তারাই দোজখী। মোট কথা, ইসলাম ও বিজ্ঞান একটা অন্যটার প্রতিবন্ধক নয় বরং পরস্পরের সহায়ক। তাই বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর "Essay on Religion and Science" নামক প্রবন্ধে বলেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। তিনি বিজ্ঞানকে, তার নিজের ক্ষেত্র, বস্তুর ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী।

এইখানে একথা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, অন্যান্য ধর্মের মূল শিক্ষা সময়ের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। এবং অলীক কাহিনী, পৌরাণিক গল্প ইত্যাদির অতল তলে ডুবে গেছে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই ঐ সব ধর্মের স্থান দখল করে ফেলেছে। তাই বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সেখানে গেলে নিষ্ফলতা ছাড়া কি আশা করা যেতে পারে? খৃষ্টানদের ধর্মে ৩=১; কিন্তু অঙ্কে বা বিজ্ঞানে কি তা

সম্ভব? বর্তমান খৃষ্ট ধর্মমতে খোদা স্বয়ং মনুষ্য-পুত্র রূপে আগমন করে সৃষ্ট জীবের পাপোদ্ধারের জন্য মানুষেরই হাতে মৃত্যু বরণ করেন—এই বিশ্বাসই পাপ মুক্তির এক মাত্র পথ। এ মুক্তির পথ বটে! যেহেতু যুক্তি এর কাছেও ঘেষতে পারে না। এ বিশ্বাস ভাল-মন্দ মূল্য বোধের ধার ধারে না। অথচ ইসলাম খোদার একত্বে বিশ্বাস ও সৎকর্মকে মুক্তির সহজ উপায় বলে বর্ণনা করেছে। এক খোদার সৃষ্টি এই প্রকৃতির একত্বের সাথে কায়-মনোবাক্যে সহযোগিতা করে শান্তিকে স্থায়ীভাবে কায়েম করাই ইসলামের আদেশ। বিজ্ঞান ও বিবেক এ শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে কি?

মোটকথা ইসলামের বৈজ্ঞানিকতা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। প্রাকৃতিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনায় যেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞান সামজস্য রক্ষায় অক্ষম, সেখানে হয়ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারটি চূড়ান্ত নয় বা তার সূত্রে কোথাও ভুল রয়েছে, নতুবা ধর্ম গ্রন্থে দেয়া বর্ণনার প্রকৃত মর্ম উদ্ধারেই আমরা ভুল করছি। ইসলাম সর্ব-জ্ঞানী, চিরজ্যোতিঃ, চিরসত্য খোদার বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বাণীতে ভুলের স্থান নেই। সেই বাণী বুঝতে আমাদের সাময়িক ভুল হতে পারে।

সর্বজ্ঞানী, চিরজ্যোতিঃ, চিরসত্যের এই মহা-বাণী আজও অবিকল অবস্থায় কোরানের পৃষ্ঠায় শোভা পাচ্ছে; তার মাঝে কত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য অন্তর্নিহিত আছে, তার ইয়ত্বা নেই। বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কোরানের বর্ণনাকে অনু-ধাবন করলে আজও বহু বৈজ্ঞানিক সূত্র ইহা হতে আবিষ্কার করা যেত। কোরান হতে এ খানে দুই একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য পেশ করছি।

কোরানের বর্ণনায় "এই বিশ্বসৃষ্টির ভিত্তি ছিল পানি।" কিছুদিন পূর্বেও বৈজ্ঞানিকরা বলতেন "উত্তপ্ত নীহারিকা" হতে সৌর জগৎ ও তাহা হতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, hydrogen Ion-এর মাধ্যমে হিম-নীহারিকা ও তার মাধ্যমে বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ পানির মাধ্যমেই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে।

কোরানে খোদা বলেছেন—"এ বিরাট বিশ্ব আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমি ইহাকে প্রসা-রিতও করতে পারি।" আশ্চর্য্যের বিষয় দিন দিন বৈজ্ঞানিকগণ ও বিশ্বের গণ্ডির প্রসারতা লাভের কথাই প্রমাণ করে চলছেন। প্রথমে বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি ১১০০০ আলোক বৎসর হবে। সেই ব্যাপ্তি এখন বৈজ্ঞানিকদের হিসাব মতেই কোটী কোটী আলোক বৎসর ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বৈজ্ঞানিকদের কাছেও দিন দিন বৃহত্তর হচ্ছে।

কোরানে খোদা বলেছেন—"তোমাদের জন্য আকাশ ও বায়ু মণ্ডলকে আমি সংরক্ষণকারী ছাদ রূপে তৈরী করেছি।" বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু যে অবস্থায় আছে তার সামান্য পরিবর্তনে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হত না। বায়ুমণ্ডল ব্যতীত জীবন সম্ভব হত না। বায়ু, বাতাস, ঋতু পরিবর্তন, সাগর, নদী এবং জীবন ধারনোপযোগী আন্যান্য উপকরণও

সম্ভব হত না। সূর্যের জ্বালাময়ী উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় ভস্ম বায়ুমণ্ডলে এসে নিয়ন্ত্রিত না হলে, জীব টিকতে পারে না। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ হতে যে অগ্নিখণ্ড উল্কারূপে নিপতিত হয়, বায়ুমণ্ডল তাহা নষ্ট করে দেয়। নতুবা উল্কার আঘাতে আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হত। এই বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গফুটে ২৬ মণেরও উপর। এই চাপকে বহন করে আমরা বেঁচে আছি। আশ্চর্য! অথচ এই চাপের কমবেশী হলেও বাঁচতে পারতাম না। এই বায়ু মণ্ডল ১২ মাইল উর্দ্ধ পর্যন্ত আছে। তৎপর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে ২০ মাইল উর্দ্ধ পর্যন্ত গিয়েছে। তারপর বায়ুও নাই, আলোও নাই, চাপও নাই। সবই অন্ধকার। সেখানে দিনেও তারকা দেখা যাবে। এর সব বর্ণনাই বৈজ্ঞানিক। ইসলাম বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন খোদার সৃষ্টি হিসাবে ইহা পেশ করে থাকে। বাস্তবিক এ পৃথিবী, এ আকাশ পরিকল্পনাকারী ও সংরক্ষণ-কারী খোদা ছাড়া কে সৃষ্টি করতে পারে? বিভিন্ন সৌর জগতের পারস্পারিক অবস্থিতি এবং একে অপরের দূরত্ব ও সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, সূর্য হতে পৃথিবীর নিরাপদ দূরত্ব নির্দ্ধারণ ও সংরক্ষণ এবং সঠিক পরিমাণে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, একজন বিজ্ঞানী পরিকল্পনাকারী ধারণা-তীত বুদ্ধি ও কৌশলে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয়ে সব রচনা করেছেন। আবহমান কালের সমবেত বৈজ্ঞানিকদের উপরে যে বিশ্ব নিয়ন্তা বৈজ্ঞানিক কাজ করে যাচ্ছেন, তার উপরে কোনও যুগের সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানীদের সাময়িক মন্তব্যের কি মূল্য থাকতে পারে? কোরানে উল্লেখ আছে—"আমি প্রত্যেক জিনিসই নরনারী বা জোড়া জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করেছি"। ch 51 v 49 / ch 36 v 36 আমরা প্রাণী জগতের সকল স্তরেই তা দেখতে পাই। কিন্তু কোরানে প্রাণী জগতের উল্লেখ নাই। বরং "প্রত্যেক জিনিসের" জোড়া রূপে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ আছে। বৈজ্ঞানিকরাও আজ প্রমাণ করেছেন যে, নিষ্প্রাণ জগতেও প্রত্যেক বস্তুর জন্যই এই নিয়ম পুরাপুরি খাটে। এমন কোন জানা বস্তু নেই, যাতে একথা না খাটে। গাছে, পাতায়, বাতাসে, ফুলে, এমন কি বৈদ্যুতিক আলো ও মৌলিক বস্তুতেও জোড়া জোড়া উপ-স্থিতি পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য লাগে যে ১৪ শত বৎসর পূর্বে এক শিক্ষা-বঞ্চিত লোকের মুখে এত বড় বিজ্ঞানের মহাসত্য প্রকাশিত হল। কোরান সর্বজ্ঞানীরই বাণী; তাই এমন হল। অতএব এমন ইসলামের কাছে, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে বৈজ্ঞানিকের মাথা হেট হবে না কেন, যেখানে জীবন্ত খোদার জলন্ত শিখা অনির্বান জ্বলছে।

ইসলামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বীকার করেও কেউ বলবেন, ইসলাম অদেখা খোদাতে বিশ্বাস আনয়নের আহ্বান জানায়, যা বিজ্ঞান বহির্ভূত। কিন্তু বিজ্ঞান যদি অদেখাকে দেখা ও অচেনাকে চেনার মত কল্পনাময়ী না হত, তাহলে তো এর অগ্রগতিই ব্যাহত হয়ে যেত। অদেখা ও অচেনা বস্তু বা নিয়ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা যদি বিজ্ঞান সম্মত হয়, তবে ইসলামের গন্তব্যস্থল সেই অদেখা খোদার অন্বেষণে প্রাণ-পণ চেষ্টা করাই বা অবৈজ্ঞানিক হবে কেন?

উপসংহারে বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিকের প্রতি আহ্বান করছি। হে বৈজ্ঞানিক! হে ধার্মিক! তোমরা একই পথের যাত্রি। সত্য সন্ধানের পথে পরস্পরকে সাহায্য কর। এবং সত্য সুন্দর জগত গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে চলো।

★

প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন—মৌলবী মোহাম্মাদ

প্রশ্ন :—কোরআন মজিদের দৃষ্টিতে 'আহ্‌মদ রছুল'-এ কি মির্যা সাহেবের দাবী ছিল?

নবুয়তের দাবীদার হওয়ার পূর্বে তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে শেষ নবী বলে মানতেন কেন? হযরত ইসা (আঃ) এর আকাশে উত্তোলনকেও তিনি পূর্বে বিশ্বাস করতেন; ইহা কি তাঁর অজ্ঞানতার কারণ ছিল?

উত্তর :—পবিত্র কোরআনে সুরা আস-সাফের বর্ণিত আহ্‌মদ রছুল হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-ই ছিলেন। আয়েতের পূর্বা-পর অংশ ধীরভাবে পাঠ করিলে ইহাই প্রতি-পন্ন হইবে। হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) আল্লাহ্-তা'লার আদেশে এই দাবীই করিয়াছিলেন।

একমাত্র আল্লাহ্-তা'লা সর্বজ্ঞ। নবীদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। যখন চরম ভ্রান্তি দেখা দেয় তখন আল্লাহ্-তা'লা নবী প্রেরণ করেন। ধর্ম-বিশ্বাসে কোথায় কোথায় বড় গলদ ঢুকিয়াছে তাহা কোন নবীরও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে জানার উপায় নাই। আল্লাহ্-তা'লা যেমন যেমন ওহির দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞান দেন, তিনি তেমন তেমন মানব জাতিকে অবহিত করেন। এক কালে মদিনায় এক ইহুদী ও এক মুসলমানের মধ্যে ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে কে বড় এই লইয়া ঝগড়া উপস্থিত হইল এবং বিষয়টি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তখন তিনি মুসলমানকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন, "যে ব্যক্তি বলে যে আমি মাত্তার পুত্র ইউনুস (আঃ) অপেক্ষা উত্তম, সে মিথ্যা বলে।"—(বুখারী)। আর এক হাদিসে আছে, "আমাকে মুসা (আঃ)-এর উপরে স্থান দিওনা।"—(বুখারী)। অথচ আবার এক দিন আসিল যখন তিনি আল্লাহ্-তা'লার নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, নবীরও দিনে দিনে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ্-তা'লা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে ওহি দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, নবুওতের দ্বার বন্ধ হয় নাই – ততদিন পর্যন্ত তিনি জনসাধারণের

বিশ্বাস পোষণ করিতেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর খাতামান নবীয়ীন হওয়ার প্রকৃত অর্থ তিনিও বুঝেন নাই। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে জানান যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) শেষ শরিয়ত দাতা নবী। তাঁহার বিধানের কোন রদদবল নাই। তাঁহার পর তাঁহার অনুগমন ব্যতিরেকে এবং তাঁহার ধর্মের সেবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অপর কোন পুরাতন বিধান সঞ্জিবিত করিতে বা নূতন কোন বিধান লইয়া, নূতন বা পুরাতন নবীর আগমনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্ণ গোলামীর বরকতে প্রয়োজন সময়ে নবীর আবির্ভাব সম্ভব এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) উক্তভাবে নবীরূপে আল্লাহ্‌-তা'লার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার দাবী। হযরত ইসা (আ)-এর আকাশে জীবিত থাকা সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌ তাঁহাকে ওহি দ্বারা না জানান পর্যন্ত তিনি সাধারণ লোকের বিশ্বাস রাখিতেন। নবীরা যাহা আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট হইতে শুনেন তাহাই বলেন। হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর পূর্ববর্তী বিশ্বাস ও পরবর্তী বিশ্বাস ও এতদুভয়ের যথা সময়ে যথাযথ প্রকাশ তাঁহার সত্যতার প্রমাণ। যাহার মনে মিথ্যা দাবীর কল্পনা থাকে সে কখনও এইরূপ দ্বিবিধ প্রকার বিশ্বাস লিখিয়া প্রকাশ করিবে না।

প্রঃ তিনি যদি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন তবে দ্বীন ইসলামকে তিনি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করলেন কোথায়? হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ যমন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এবং হযরত খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সেই আদর্শকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, আপনাদের দিকে তাকালে তো সেই ইসলামের কিছুই দেখতে পাই না। তবে কি ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত হয়ে গেল?

উঃ মানব জাতি যখন সমষ্টিগত ভাবে শয়তানের গোলাম হইয়া দুঃখ, অশান্তি ও হাহাকারে পড়ে, আল্লাহ্‌-তা'লা তখন আপন করুনায় তাহাদিগকে শয়তানের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নবীর আবির্ভাব করেন। শয়তানের আসন রাষ্ট্রীয় গদিতে থাকে না; পরন্তু মানুষের মনের গদিতে থাকে। যাহারা তাহাকে গ্রহণ করে তাহারা শয়তানের কবল হইতে আবার স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় এবং তাহারা সেই সঙ্গে অপরের স্বাধীনতা ও অধিকার স্বীকার করে ও মানিয়া চলে। ঘটনার স্বাভাবিক ধারায় তাহারা যে সমাজ বা রাজ্য গঠন করে উহাই উদ্ধার প্রাপ্ত ও নবীর উত্তরাধিকারী হিসাবে উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজ ও জাতি। এ কাজ এক দিনে সমাধা হয় না। একজন, দুইজন নহে, সমস্ত জাতির ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যে সকল নবী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন তাহাদিগের জন্য শরিয়ত চালু করার জন্য বিরুদ্ধ প্রভাব ও শক্তি-মুক্ত সমাজ ও জাতির প্রয়োজন। যেমন হযরত মুছা (আঃ) ফেরআউনের হাত হইতে বনি-ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করিয়া কেনানের বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে লইয়া ফিরিয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-ও তাঁহার সাহাবাগণ

১৩ বৎসর নানা রূপ কষ্ট ভোগ করার পর মদিনায় স্বাধীনভাবে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল নবী ধর্ম পরিবর্তন না করিয়া জাতির সংস্কারের জন্য আসেন তাঁহাদিগের কাজ ধীর ও দীর্ঘকাল-ব্যাপি হইয়া থাকে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি ঈহুদি জাতির সংস্কারের জন্য আসিয়াছিলেন। খৃষ্টানদের এই কাজ করিতে বহুকাল লাগিয়াছিল। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সংস্কারক নবী। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর গোলাম হিসাবে তিনি বিশ্বের জাতিপুঞ্জের সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এক জাতির সমস্ত মানুষের সংস্কার করা সহজ কাজ নহে। জগতের সমস্ত জাতির সংস্কার আরও বেশী কঠিন, আরও বেশী সময় সাপেক্ষ। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় কাজ ছিল পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শকে আদি আকারে পেশ করা ও সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করা। এই কাজে তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন। ইহা আপনার অজানা নাই এবং থাকা উচিৎ নহে যে, হযরত মসিহ্ মাউদ আঃ)-এর আগমনের পূর্বে মুসলমানগণ রাজ্য হারা হইয়া, ধর্ম বিষয়ে সকলের নিকট আলোচনায় পরাজিত হইয়া ক্ষীণ ও স্খলিত কলেবর হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়। কোন আলেম, উলেমা, পীর, ফকির, পণ্ডিত ও পাদ্রী ধর্মবিষয়ে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর মোকাবেলায় খাড়া হইতে পারে নাই। তাঁহারই অনুগমনে আজ আহ্মদীয়া জমাতের মোবাল্লেগগণ যে দেশে ও যে জাতির নিকট গিয়াছে, তাহাদিগকে ধর্মের আলোচনায় পরাজিত করিয়া চলিয়াছে এবং দিনে দিনে আহ্মদীর সংখ্যা সর্বত্র বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ আহ্মদী জমাতের বিরুদ্ধে গিয়া কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির ধর্ম বিষয়ে পরাজয় বরণ করা ছাড়া উপায় নাই। মোকাবিলার আর এক অবাঞ্ছিত উপায় আছে যাহা উষ্ণ মস্তিষ্ক ও যুক্তিহীন ব্যক্তির কাজ, যথা —গালিগালাজ মিথ্যার আশ্রয় ও মারামারি — গত পাঞ্জাব হাঙ্গামায় যে আদর্শ "লা ইকরাহা ফিদ্দিন" ধর্মের ওয়ারিশ হইবার দাবীদার উলেমাগণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুতরাং আহ্মদীয়া জমাতের কাজ সকল জাতির কর্মশীল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংশোধন করিয়া সৎ জাতিতে পরিণত করিয়া বিশ্বে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সে কাজ তারা সনৈঃ সনৈঃ করিয়া চলিয়াছেন।

প্র :— মীর্যা সাহেবকে নবী এবং মাহ্দী মানার ব্যাপারে আপনাদের মধ্য হইতে উৎপন্ন দুইটি সম্প্রদায় এক না কেন?

উ : হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর জীবদ্দশায় এবং তাহার প্রথম খলিফার খেলাফৎ-কাল পর্যন্ত আহ্মদীয়া জমাত অভিন্ন ছিল। যাহারা পরে দ্বিতীয় খলিফার নির্বাচন উপলক্ষে জমাত ছাড়িয়া বাহির হইয়া যান—মীর্যা সাহেবের মাহ্দী ও নবী হওয়া সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল তাহা তৎকালীন পুস্তকে ও পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। সেই মত ও বিশ্বাস হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর যাহা যাহা দাবী

ছিল এবং কাদিয়ান জমাত আজও যাহা বিশ্বস্ততার সহিত মানিয়া আসিতেছে তাহার হুবহু অনুরূপ। তাহারা কাদিয়ান হইতে বাহির হইয়া লাহোরে স্বতন্ত্র দল গঠন করিবার ওযুহাত স্বরূপ তাহাদের মতের পরিবর্তন করে। সুতরাং জমাত ছাড়িয়া দল গঠন করার কৈফিয়ৎ আমাদিগের নিকট যুক্তি সঙ্গত ভাবে চাওয়া উচিৎ নয়। কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব তাহাদের যাহারা জমাত ছাড়িয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে 'Truth about the split' নামে একখানা বই আছে তাহা পড়িতে পারেন। ইহার নজীর ইসলামের প্রাথমিক যুগেও রহিয়াছে—যাহার ফলে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

প্র ঃ—জাফরুল্লাহ খানের মত লোক যদি ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পৃথক জ্ঞান করে জাতিসংঘ বা অন্য কোন রাষ্ট্রের গদি দখল করে বসে থাকেন, তবেই কি আপনা আপনি পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম হবে? ইসলামী জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনীতি করাও কি আপনাদের দৃষ্টিতে হারাম?

উ ঃ—আমি উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহা বুঝিয়া পাঠ করিলে আপনার এ প্রশ্ন থাকিবে না। সমস্ত বিশ্বকে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ইসলামে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কোন রাষ্ট্রই আজ আর আমাদিগের জন্য "অপর" নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আমাদিগের। সুতরাং চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁন সাহেব "অপরের" গদী দখল করেন নাই। তিনি রাজনীতির বাহিরেও নহেন। আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ন্ত্রনের মূলে বসিয়া ইসলামী নীতি বর্ণনায় ও স্বয়ং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী নীতি পালনে কোন দিন কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আপনার প্রশ্ন যুক্তির ধারা দিয়া চলে নাই।

প্র ঃ—যে সরকার কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না—তার আনুগত্য কি করে স্বীকার করা যায়? আপনাদের প্রচারকদের কথায় বুঝা যায়, যে কোন সরকারেরই অন্ধভাবে অনুগত্য স্বীকার করতে হবে। যেমন নাকি মীর্যা সাহেব বৃটীশ সরকারের আনুগত্য করাকে ধর্মের একটি অংশ বলে আখ্যা দিয়াছেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আপনারা ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার করে সংশোধন করার প্রয়োজন মনে করেন না। কেন?

উ ঃ—আমি ১৯৬৩ সনের ১৫ই ডিসেম্বরের আহ্‌মদীতে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে শুধু এতটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইসলাম কোন ব্যক্তিকে, কোন রাজ্যের অধীনে বাস করিয়া বিদ্রোহ করিবার অধিকার দেয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। যখন ধর্মে হস্তক্ষেপ করে, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের অনুসরণে বরদাস্ত করিতে হইবে এবং আইন সঙ্গত ভাবে রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের অসুবিধা পেশ করিতে হইবে। যখন হস্তক্ষেপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়া যাইবে, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হিজরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ

করিয়া অন্য রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে। দুঃখের বিষয় আপনারা ইসলাম না জানিয়া ইসলাম ও রাজনীতির কথা বলেন।

প্র :—রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ধর্ম কি আপনাদের মতে আলাদা জিনিস? যদি তাই হয়ে থাকে তবে কি দুনিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইহার কতৃত্ব এবং নেতৃত্ব ধর্ম বিমুখ ও খোদাদ্রোহীদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে আনুগত্য স্বীকার করে গেলেই কি ইসলাম জীবিত হয়ে উঠবে?

উ :—আপনার এই প্রশ্নের উত্তর উপরেই দেওয়া হইয়াছে। তবুও আপনাকে শুধু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মক্কার জীবন ও মদীনার জীবন ভালভাবে পাঠ করিয়া দেখিতে বলি। সেইখানেই আপনার প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে।

যখন জন সাধারণ খারাপ হইয়া যায়, তখন নির্দোষ নেতৃত্ব পাওয়া কঠিন। নেতৃত্ব সাধারণতঃ দুই ভাবে গড়িয়া উঠে। এক নির্বাচন দ্বারা এবং আর এক শক্তির দ্বারা। যখন জন সাধারণের ভোট ক্রয় করিবার সুযোগ থাকে তখন ভাল নেতৃত্ব পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়—শক্তির দ্বারা যে নেতৃত্ব কায়েম হয়, সেই শক্তির অধিকারী যদি সৎ সাধু ও প্রজা হিতৈষি হয় তাহা হইলে উহা শান্তি ও সুখের কারণ হয় নচেৎ অন্য রূপ হয়। সুতরাং সার কথা এই যে, প্রথম পন্থায় কল্যাণকর নেতৃত্ব পাওয়ার আশা মরিচিকায় জলের আশার ন্যায় এবং দ্বিতীয় পন্থায় অনিশ্চিত। কল্যাণকর নেতৃত্ব লাভের পন্থা হইল নিজে ভাল হওয়া এবং সকলকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সৎ করার চেষ্টা করা। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, 'মানুষের দেহে ক্ষুদ্র এক টুকরা মাংস আছে যাহাকে দিল বলে। উহা ভাল হইলে তাহার ভিতর বাহির সব ভাল—তাহার গৃহ, তাহার পরিজন, তাহার সমাজ, তাহার রাষ্ট্র সব ভাল, নচেৎ সব উল্টা'। নিজে ভাল হওয়া এবং মানুষকে ভাল করার চেষ্টা সুনিশ্চিত ও উত্তম পন্থা। আল্লাহ্-তা'লার নবী ও তাহার জমাত সদা এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। নবী ও নবীর জমাত ছাড়া ধর্ম বিমুখ খোদাদ্রোহী জনসাধারণকে খোদামুখি করা অন্য কাহারও কাজ নয়। সতত নেতাকে বার বার বদল করার চেষ্টা অপেক্ষা নেতার দিলকে ভাল করার চেষ্টা করাই নিরাপদ। কারণ নেতাকে বদলাইয়া আর এক নেতা আনা প্রতিকারের অর্থ নয়, বরং অনেক সময় মরণের পথ হয়। নিরাপদ পথে চলাই শ্রেয়ঃ। নেতা ও নেতা গঠণকারী জন সাধারণ—সকলেরই দিলকে ভাল করিতে যত্নবান হওয়া সকল দিক থেকেই নিরাপদ ও ফল প্রাপ্তির দিক থেকে সুনিশ্চিত। আপনারা প্রতিকারের যে পথে চলিতে চান, উহা ভ্রান্ত পথ—ঘোর অন্ধকারে হাতড়ানর ন্যায়। উহা জীবনের পথ নয়—উহা মরণের পথ। যাহারা জগতের কল্যাণকামী, তাহারা নিঃস্বার্থভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ ও সাধু করার চেষ্টা করিবে। ইহা ছাড়া ভিন্ন পথ যাহারা ধরিতে চায় তাহারা ভ্রান্ত পথে চলে। আহ্‌মদীয়া জমাত তাই নেতা-অনেতা, জাতি বিজাতি সকলকে নিজের আপন ভাই মনে করিয়া সকলকে ভাল করার কাজে রত আছে এবং আল্লাহ্-তা'লার নিকট সতত দোয়া করে। সর্ব প্রশংসা আল্লাহ্-তা'লার।

★

পরলোক

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এই কিছুক্ষণ পূর্বে একজন মানুষ বাকশীল ও কর্মমুখর ছিল। সে নড়া-চড়া ও চলা-ফিরা করিতেছিল, হাসিতেছিল ও কথা বলিতেছিল। শত সুখ দুঃখ, ভালমন্দ, লাভক্ষতি, পাপ পূন্য এবং আশা আনন্দের ঢেউয়ে সে উদ্বেল ছিল। সহসা দেখি তাহার নড়া চড়া, হাসি কান্না সব থামিয়া গেল; তাহার সকল কর্মের অবসান হইয়া গেল। সে নির্বাক। দেহখানি তাহার নিশ্চল ও নিস্পন্দ। নির্বিকার ভাবে সে বিভোর। শত ডাকেও আর সে সাড়া দিবে না। মারিলেও সে কিছু বলিবে না। তাহার সম্মুখ দিয়া তাহার সব কিছু হরণ করিয়া লইয়া গেলেও সে প্রতিবাদ করিবে না, বাধা দিবে না। মূহুর্তে কি ঘটিল তাহার? কিছুক্ষণ পূর্বে কি ছিল তাহার মধ্যে এবং এখন কি নাই? যাহা ছিল তাহা কোথায় ছিল এবং যাহা গেল তাহা কোথায় গেল? তাহার সারা দেহ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেও কোন কিছু চলিয়া যাওয়ার জড় চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। তাহার দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু উহার মিষ্ট উত্তাপ খানি হারাইয়া গিয়া উহা তুহিন শীতল হইয়া গিয়াছে। এখন সারা বিশ্বের আগুণ দিয়াও আর তাহার দেহের উত্তাপ ফিরাইয়া আনা যাইবে না। যে রহস্য গোপনে থাকিয়া তাহার দেহখানিকে উত্তপ্ত রাখিয়াছিল সারা বিশ্ব খুঁজিয়া ফিরিলেও কোন দিন আর উহার কোন সন্ধান মিলিবে না। ইহাকেই আমরা ব্যক্তির মরণ নামে অভিহিত করি। আমরা বলি তাহার রুহ বা আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা এক অদৃশ্য শক্তিরূপে তাহার দেহে বিরাজ করিতেছিল। ইহাই তাহার দেহকে উত্তপ্ত, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কর্মশীল, মস্তিষ্ককে সদা চিন্তাশীল এবং হৃদয়কে আশা আনন্দে ভরপুর রাখিয়াছিল। উহাই তাহার দেহের মালিক এবং চালক ছিল। উহা দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। দৃশ্যলোক হইতে অদৃশ্যলোকে, রূপলোক হইতে অরূপলোকে, মরলোক হইতে উহা অমরলোকে, তথা ইহলোক হইতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে সে। এ ভূবনের কোন আকর্ষণ, কোন ডাক আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। এত দিন সে যে দেহ ধারণ করিয়াছিল, উহারই জন্য ছিল তাহার সব মনোযোগ, সব চেষ্টা এবং ভয় ভাবনা; কিন্তু মরণে আজ উহা ছাড়িয়া গিয়া সে জানাইয়া দিল যে, উহার মূল্য ক্ষণিক বাসের প্রয়োজন মিটাইবার অতিরিক্ত আর কিছুই ছিল না।

দেহ ছাড়িয়া আত্মা কোথায় কি উদ্দেশ্য সাধিতে গেল, ইহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সে জন্য আত্মার স্বত্বা ও প্রকৃতি কি এবং কোথা হইতে উহা আসিল তাহা আমাদিগের বুঝা প্রয়োজন। নচেৎ উহার লোকান্তর গমণ এবং পরলোকে তাহার অবস্থা বুঝা সম্ভবপর হইবে না।

(ক্রমশ:)

খেলাফতের বরকত দীর্ঘ হওয়ার জন্য দোয়া

হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাজিঃ)

জমাতের মুখলিস ব্যক্তিগণ একান্ত আন্তরিকতার সহিত হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লার আরোগ্য ও স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিতেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুস্থতার কারণে কাহারও কাহারও চিত্ত চাঞ্চল্যও ঘটিতেছে। অন্য দিকে জমাতের কোন কোন বন্ধু হুজুরের আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে স্বপ্নও দেখিতেছেন। স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ খোদা জানেন। 'তকদীরের' বিষয়ও খোদার হাতে। ইহা তিনি তাঁহার বিশেষ প্রজ্ঞানুসারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। যাহা হউক বন্ধুগণ দোয়া করিতে থাকিবেন। কারণ বান্দার কাজ চাওয়া এবং খোদা-তা'লার কাজ হইতেছে তিনি কাহারও দোয়া বাহ্যিক ভাবে কবুল করেন অথবা হাদিসের বর্ণনানুযায়ী দোয়ার বরকত সমূহকে পরবর্তী জীবনের জন্য সঞ্চিত রাখেন।

কোন কোন নবী পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী অসুস্থ রহিয়াছেন। কাহাকেও কাহাকেও আল্লাহ্-তা'লা আরোগ্য দিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও সময় পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে খোদা আপনার নিকট উঠাইয়া নিয়াছেন। আমাদের প্রভু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম (ফিদাহু নাফ্‌সি) প্রায় দুই সপ্তাহ্ প্রবল জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। সেই সময়ে সাহাবাগণ হুজুরের স্বাস্থ্য লাভের জন্য কতভাবে, কত দরদ ও হৃদয়ের আবেগ সহকারে দোয়া করিয়াছিলেন তাহা শুধু সেই ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন যিনি সেই অতুলনীয় প্রেম সম্বন্ধে অবগত—যাহা সাহাবাগণের হৃদয়ে তাঁহাদের প্রিয় প্রভুর জন্য ছিল। কিন্তু যেহেতু اليوم اكملت لكم دينكم। ('আজিকার দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতম পর্যায়ে পৌঁছান হইয়াছে') বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই জন্য খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হইল এবং পূর্বাহ্নে সংবাদ লাভ সত্ত্বেও কোন কোন সাহাবা — যাহাদিগের মধ্যে হযরত উমর রাযি আল্লাহু আন'হুর ন্যায় জলিলুল্-কদর সাহাবীও ছিলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ওফাত অসময়ে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা হুযুরের শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুতরাং বন্ধুগণকে হযরত খলিফাতুল মসিহ (আইয়েদাহুল্লাহু বেনাস্‌রিহিল্ আযীয)-এর স্বাস্থ্য লাভের জন্য দোয়া করিবার বিষয় স্মরণ করিতে যাইয়া 'রহিম করীম' খোদার শোকর করিতেছি যে, তিনি হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লার দীর্ঘ খেলাফতকে এমন অসাধারণ সাহায্য ও বরকত দিয়াছেন যাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। প্রকৃতপক্ষে, চিন্তা করা হইলে হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি আইয়েদাহুল্লাহু তা'লা সম্বন্ধে ঐ সমস্ত এল্‌হামই পূর্ণ হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহেস্ সালামের উপর নাযিল হইয়াছিল। কোন একটি নিদর্শন নাই, যাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাহা হুযুরের মধ্যে পূর্ণ হয় নাই। খোদার কালাম সব দিক দিয়া পূর্ণ শওকত সহ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

খোদা-তা'লা ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, 'প্রতিশ্রুত

পুত্র' 'জালালে-ইলাহীর' প্রকাশের স্থল হইবেন। জগদ্বাসী জানে যে, হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার দ্বারা খোদা-তালার কত বার 'জালালী শান' প্রকাশিত হইয়াছে। খোদা-তা'লা বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'দৃঢ়-চিত্ত' হইবেন। জমাত দেখিয়াছেন যে, হযরত খলিফাতুল-মসিহ সানি আইয়্যেদা-হুল্লাহু-তা'লার জালালী স্বভাবের সহিত বার বার এত অধিক মাত্রায় হুযুরের দৃঢ়চিত্ততা প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহা গণনা করা যায় না। খোদা-তা'লা বলিয়াছিলেন তিনি 'তিনকে চারি করিবেন!' বন্ধুগণ জানেন যে, হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহেস সালামের ওফাতের সময় আমরা শুধু তিন ভাই ছিলাম। কিন্তু কি প্রকারে আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার অসাধারণ হস্তক্ষেপ দ্বারা ১৯৩০ সনে দীর্ঘকাল সম্পর্কশূন্যতার পর আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মীর্যা সুলতান আহ্মদ সাহেবকে ৭৫ বৎসর বয়সে আমাদের ভ্রাতৃত্বের গণ্ডীতে আনয়ন করেন। খোদা বলিয়াছিলেন যে, 'প্রতিশ্রুত পুত্র' 'জাহেরী ও বাতেনী' জ্ঞানরাশি দ্বারা ভরপুর হইবেন। জমাতের অল্প বয়স্ক বালকগণও ইহা অবগত যে, হযরত খলিফাতুল-মসিহ্ প্রচলিত শিক্ষালাভ না করিয়াও অর্থাৎ কোন জাহেরী পরীক্ষায় পাস না হওয়া সত্বেও আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে তাঁহার কলম এবং মুখনিঃসৃত কোরআন মজীদের তফসীর ও সালানা জলসার বক্তৃতাগুলির মধ্যে এত জ্ঞান ধারা প্রবাহিত হইয়াছে যে, জগৎ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। তারপর খোদা-তা'লা বলিয়াছিলেন, 'জাতিগণ তাঁহার দ্বারা আশিস লাভ করিবে'। আজ দেখুন হযরত খলিফাতুল মসিহ্র দরদমন্দ দোয়া ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে কমুনিষ্ট দেশগুলি ছাড়া (ঐ গুলিতে আমাদের মুবাল্লিগগণের যাওয়ার অনুমতি নাই) পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আহ্মদী মুবাল্লিগগণের প্রচেষ্টায় ইস্লামের পতাকা পত পত করিয়া উড়িতেছে। যে সকল দেশে আহ্মদী মুবাল্লেগ পৌঁছেন নাই, ঐসব দেশেও পার্শ্ববর্তী দেশগুলি হইতে প্রভাব পড়িতেছে। এই সকল এবং আরও কত নিদর্শন যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

সুতরাং, নিশ্চয় হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ (আইঃ) সম্বন্ধে হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহে সালামের সব ভবিষ্যদ্বাণীই অসাধারণ ভাবে সফল হইয়াছে এবং ইহাই সত্য যে, এমন কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী নাই, আল্লাহ্-তা'লার চিরাচরিত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা লইয়া কোন আপত্তি করা যায়। কোন সন্দেহ নাই যে, খোদা-তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং খোদা-তা'লার নিয়ামাৎ চরমত্ব লাভ করিয়াছে। এখন আমাদের দোয়ার উদ্দেশ্য কোন ভবিষদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য নহে, বরং খেলাফতের বরকতরাজি দীর্ঘ হওয়ার জন্য।

و نرجو من الله خيرا و ما ذالك
على الله عزيز و لا حول و لا قوة الا
با لله العظيم -

অনুবাদক—এ. এইচ. মুহম্মদ আলী আন্ওয়ার

★

* যদিও হুজুর (আইঃ) আজ স্বয়ং জমাতের সকল কাজে মনোযোগ দিতে পারেন ন

তথাপি জমাতের অগ্রগতি ব্যহত না হইয়া জমাত দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী জমাতের কর্মকর্তাগণ অতি দক্ষতার সহিত জমাতের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার নেতৃত্ব এবং শিক্ষার স্পর্শে তাঁহার সুযোগ্য সন্তান এবং জমাতের আলেমগণ পবিত্র কোরআনের অফুরন্ত জ্ঞানের প্রবাহকে লেখা, কথা এবং কাজের মাধ্যমে অব্যাহত রাখিয়াছেন। যাহারা তাঁহাদিগের রচিত নিত্য নূতন পুস্তক এবং জলসার মধ্যে তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহারা এ সত্যের সাক্ষ্য দিবেন। ইতিপূর্বে এক মুখে যে ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, আজ তাহা বহুমুখে উৎসারিত হইতেছে। এক প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

—সম্পাদক, আহ্‌মদী

Published & printed by Md. Fazlul Karim Mullah at Shajahan Printing works for the proprietors, 'East pakistan Ajuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar